

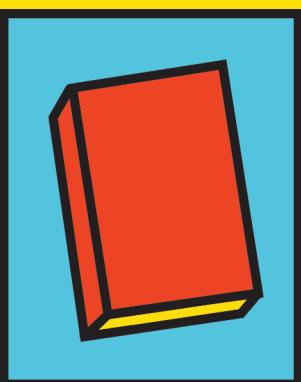
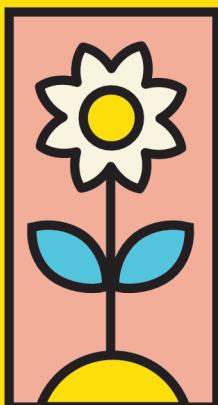
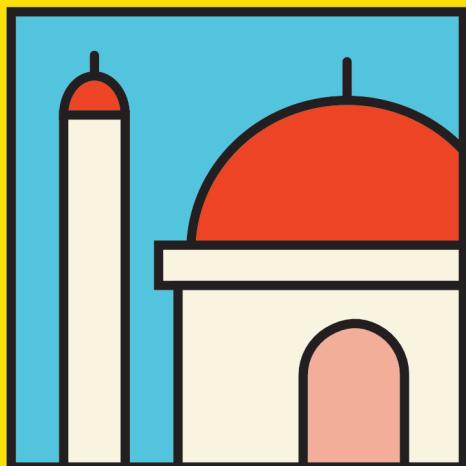
ডিসেম্বর ২০২১
জ্ঞানদিউল আওয়াল ১৪৪৩

গল্প

সীরাহ

প্রবন্ধ

কবিতা





নিত্যদিনের পঁয়োজনে



ORDER NOW



/anbarbd/

 DELIVERY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



মোলো ডিসেন্সর সংখ্যা, ২০২১
প্রস্তুতি ক মোলো

সার্বিক তত্ত্ববিধানে: মোলো
সম্পাদনা: লস্টমডেস্টি
প্রকাশনায়: সন্দীপন প্রকাশন

মোলো ফেসবুক পেইজ
facebook.com/SholoOfficial



লস্টমডেস্টি
www.lostmodesty.com
facebook.com/lostmodesty

মুক্ত বাতাসের খোঁজে ফেসবুক গ্রুপ
facebook.com/groups/lostmodesty.volunteers

প্রাপ্তিহান:

সন্দীপন

সন্দীপন প্রকাশন
৩৪, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮০৬ ৩০০ ১০০

অনলাইন পরিবেশক:
ওয়াক্স লাইফ, রকমারি

মূল্য : ৭০ টাকা

অন্দরমহল

০৩

শুরুর কথা

০৪

শুভেচ্ছা বার্তাগুলো

০৫

টুকলিবাজি

১৪

বদলে যাবার দিনে

২৪

অতঃপর,
হাসনাহেনা হেসেছিল

২৯

ফড়ং

৩০

চলো গল্প শুনি

৩৩

শেষ ঠিকানা

একটা লাশ

৩৬

বিন্দু থেকে সিক্কু

৩৭

কুয়াশার চাদরে

৮০

জুমুআবার,
দ্যা গ্রেইট ডে

৪৫

ডাক্তারখানাঃ
ব্রণ বনাম বয়ঃসন্ধি

৪৮

হে মুসআব! আপনাকে
আমার খুব সৌর্য্যো হয়

৫২

বন্ধুদের ‘হাস্যকর নাম’
বানিয়ে মজা করো

৫৫

আমার পরীক্ষা

৫৭

রবের উপহার

৬০



শুরুর কথা...

বয়ঃসন্ধিকাল।

অঙ্গুত এই বয়স! অনেকগুলো ফ্যান্টেরের সাথে বোঝাপড়া করতে হয় একটা ছেলেকে এই সময়। বড়ো তেমন কাছে টানে না, একটু দূরে সরিয়ে রাখে। শরীরে পরিবর্তন আসে, পরিবর্তন আসে হায়েও। এমন অনেক অনুভূতির ঝাঁপি খুলে যায় যা আগে বন্ধ ছিল। পৃথিবীটা দুর্নিবার আকর্ষণে বাহিরে টানে। আবার অজানা এক ভয়, শক্তি কাজ করে। অসংখ্য এবং বিপরীতমূর্তী অনুভূতিগুলোর মাঝে পড়ে ছেলে-মেয়েরা এই সময় দিশেহারা হয়ে যায়। ভুল করে। এই বয়সটাই তো ভুল করার।

নিজের এবং বিপরীত লিঙ্গের শরীর, বাহিরের পৃথিবী নিয়ে অসীম কৌতুহলী মনে একবাঁক প্রশ্ন ঘূরাফেরা করে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন না বড়ো, যাদের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। বয়ঃসন্ধিকালের জটিলতা নিয়ে কিশোররা যতটা নাজেহাল হয়, কিশোরীরা তেমন হয় না। মা, বড়বোন বা অন্য কোনো নিকটাত্ত্বদের ঠিকই পাশে পায় তারা। কিন্তু কিশোরদের পাশে তেমন কেউ এসে দাঁড়য় না। কিশোর-মন তখন উত্তর খুঁজে বেড়ায় ইচ্ছে পাকা বন্ধুদের কাছে, ইন্টারনেটে। অধঃপতনের ব্যাকরণ লেখা শুরু হয় ঠিক তখন থেকেই। শুধু সেই কিশোর বালকের না, অধঃপতনের ব্যাকরণ লেখা শুরু হয় একটা সমাজ, একটা দেশেরও।

বলা হয়ে থাকে, ১২-১৩ বছরের ছেলেদের মতো এমন বালাই আর নেই। এরা হলো প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো। অনেকাংশেই সত্য। এই অবহেলা, উপেক্ষা, অনাদারে ঘরের এককোণে নিজের শরীর, সমাজ আর পৃথিবীটাকে নিয়ে সক্ষোচ, দ্বিধায় ভোগা, হাজারো ভুল করা কিশোর-কিশোরীদের কাঁধে ভাই/বোন হয়ে হাত রাখতে এগিয়ে এসেছেন কিছু মহৎপ্রাণ মানুষ। ‘মুক্ত বাতাসের খোঁজে’ ফেইসবুক প্রফ্যুমের মাধ্যমে তাঁরা বেশ কয়েকবছর ধরেই বয়ঃসন্ধিকালীন বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেবার চেষ্টা করছেন। উপেক্ষার শিকার বাংলাভাষী এই কিশোর-কিশোরীদের জন্য তাঁদেরই একটি প্রচেষ্টা এই ‘যোলো’ ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনটি থেকে ইনশাআল্লাহ বাংলাভাষী ‘যোলো’রা অনেক উপকৃত হবে। তারা জীবনের ভুলগুলো চিনতে এবং সেগুলো শুধরে নেবার অনুপ্রেরণা, শক্তি, সাহস পাবে।

ম্যাগাজিনটির ইতোমধ্যে অনলাইনে বেশ কয়েকটি সংখ্যা বের হয়েছে এবং পাঠকপ্রিয়তাও পেয়েছে। যোলোদের ব্যাপক আবদারের মুখেই যোলো ম্যাগাজিন অনলাইন কপি থেকে মলাটবন্দ হয়ে আপনাদের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ম্যাগাজিনের সাথে অনেক মানুষের শ্রম, ভালোবাসা, আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। একে একে তাঁদের সবার নাম নিতে গেলে আর একটি বই বের করতে হবে। যোলোর পক্ষ থেকে সবার প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। ম্যাগাজিনটি মলাটবন্দ করার ক্ষেত্রে সন্দীপন প্রকাশন-এর আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ম্যাগাজিন, ম্যাগাজিনের লেখক-পাঠক এবং ম্যাগাজিন সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করে নিন। আমীন।

লস্ট মডেল্টি

২১ নভেম্বর ২০২১



দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, পপুলার কালচার এবং মিডিয়ার মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা ও আদর্শ এদেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কাজ চলছে। তবে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে হবার কারণে ব্যাপারটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এ এমন এক আদর্শ যা মানুষকে সব নেতৃত্বার কেন্দ্র বানায়। মানুষের খেয়াল-খুশি কিংবা ভালো লাগাকে বানায় চূড়ান্ত মাপকাটি। যে আদর্শ শেখায় ‘বাধ ভাঙ্গ’ আর ‘সীমানা পেরিয়ে’ যাবার মাঝেই আছে প্রকৃত আনন্দ ও মুক্তি। যা অঙ্ককারকে আলো আর আলোকে অঙ্ককার হিসেবে উপস্থাপন করে। এই আদর্শ আমাদের না। এর জ্ঞান, বিকাশ ও প্রচার হয়েছে পশ্চিমে। আমাদের বিশ্বাস, পরিচয় এবং নেতৃত্বার সাথে এই আদর্শ সাংঘর্ষিক। কিন্তু তবুও নানাভাবে এই আদর্শে দীক্ষিত করা হচ্ছে সমাজকে। আর এর মূল নিশানা বানানো হয়েছে কিশোর-কিশোরীদের।

ফলাফল আমাদের চোখে সামনে। পত্রপত্রিকার পাতা থেকে শুরু করে, সেশ্যাল মিডিয়া, সমাজ, পরিবার এমনকি পথেগাটে। অবক্ষয়, অবনতি, অস্থিরতা, ক্রোধ, অশান্তি। প্রকাশ্য এ চিহ্নগুলো ছাড়াও এ অসুখ ভেতর থেকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে সমাজকে। প্রত্যেক প্রজন্মের সন্তানেরা তাদের বাবা-মা, ঐতিহ্য থেকে আগের প্রজন্মের চেয়ে আরও বেশি হারে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রত্যেক প্রজন্মের মনে হচ্ছে, তারা একা, তাদের কেউ বোঝো না। তারা অবিচারের স্বীকার। বাড়ছে জনক ও জাতকের মধ্যে দৰ্দ। প্রসারিত হচ্ছে দূরত্ব। বড় হচ্ছে ফাটল। ভেঙ্গে পড়ছে পরিবার ও সমাজের বাঁধন।

এই রাস্তার শেষ কোথায়, আমরা জানি। এখানে বড় কোনো রহস্য নেই। আজকের পশ্চিমের সমাজ, পরিবার এবং নেতৃত্বার দিকে তাকালেই এই যাত্রার পরের স্টেশনগুলোকে চেনা যায়। তবুও গভীরভাবে ব্যাধিগত্ত্ব এ আদর্শকে সুন্দর মোড়কে মুড়িয়ে আমাদের সমাজে প্রচার করা হচ্ছে। নানাভাবে তা দুকে পড়ছে আমাদের ঘরে। শেকড় গাড়ছে আমাদের কিশোর ও তরুণদের মন ও মগজে। এর পেছনে কাজ করছে অর্থ, ক্ষমতা ও প্রভাবের বিশাল মেশিনারি। এই আগ্রাসন থামানো আপাতভাবে কঠিন মনে হয়। কিন্তু মিথ্যা যত বড়, যত অপ্রতিরোধ্যই মনে হোক না কেন; বরাবরই দুর্বল। মাকড়সার জালের মতো। সূক্ষ্ম, তারিফ করার মতো জাঁচিল, কিন্তু ভঙ্গুর। এই জাল ভাঙ্গার আয়োজন নিয়ে যোলো কাজ শুরু করেছে। যোলো’র জন্য শুভেচ্ছা রইল।

আসিফ আদনান
লেখক ও গবেষক

যোলো



কিশোর-কিশোরীদের জন্য বাজারে প্রচলিত ম্যাগাজিনগুলো হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখুন। এই ম্যাগাজিনগুলো কিশোর-কিশোরীদের মনোবিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখার দাবি করে। কিন্তু আপনি অবাক বিস্ময়ে দেখবেন, এরা দিনশেষে আমাদের আদরের ছেট ভাই-বোনদের, আমাদের সন্তানদের পাশ্চাত্যের অধঃপতিত জীবনধারার দিকে ডাকছে। আপনি দেখবেন, এরা মেয়েদের শেখাচ্ছে, কীভাবে লজ্জা ভেঙ্গে ছেলে বন্ধুদের সাথে পরিয়ড নিয়ে কথা বলতে হয়, ছেলে বন্ধুদের সাথে হ্যাং-আউট করতে হয়, ট্যুর দিতে হয়। আমার আপনার ছেট ভাই-বোনদের এরা প্রেমের সবক দিচ্ছে, গর্ভপাতের পথ চেনাচ্ছে। বিজ্ঞান শেখানোর নামে ধর্ম-বিদ্যে, ক্যারিয়ার গাইডেস দেবার নামে সেকুলারিসমের দীক্ষা দিচ্ছে।

নাটক, সিনেমা, সিরিয়াল, সাহিত্য, নিউজ মিডিয়া, ম্যাগাজিন ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রমাগত মগজিনেলাই এর শিকার হচ্ছে আমাদের ছেট ভাই-বোনেরা। আমাদের অজাত্তেই সে পরিণত হচ্ছে অন্য এক মানুষ—যে আধুনিকতা মানে বোঝে পাশ্চাত্যের মতো উদ্দাম জীবনে গা ভাসানো, বিজ্ঞান চার্চা মানে বোঝে ইসলামকে আক্রমণ করা, সংস্কৃতি চার্চা মানে বোঝে অশ্লীলতা। আমরা বুঝি না, বুঝতে চাই না বা বুঝলেও হয়তো পাতা দিই না। দিহান-আনুশকার মতো কোনো ঘটনা ঘটলে তখন হ্রশ ফেরে আমাদের। কিন্তু তখন আফসোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না আমাদের।

২০১৩ পরবর্তী বাস্তবতায় বাংলাদেশে সুস্থ ধারার বইয়ের বিপ্লব ঘটেছে। ২০১৭ পরবর্তী সময় থেকে বই বসন্ত চলছে। বহুবছর ধরে কালচাড়াল এলিটেরা সাহিত্যের জগতে যে মিথ্যাচার, অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতার প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল, তা তাসের ঘরের মতোই ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক কিশোর-কিশোরীদের জন্য ইসলামপন্থীদের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। তাদেরকে কেন্দ্র করে তেমন কোনো কাজ হয়নি। লস্ট মডেস্ট চিম বা আরও কিছু অলাভজনক সংস্থা এবং ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগে কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। এমন পরিস্থিতিতে যোলো ম্যাগাজিনের প্রকাশ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। ইনশাআল্লাহ, যোলো ম্যাগাজিন বাংলাদেশের লাখ লাখ কিশোর-কিশোরীদের মনোবিকাশে কল্যাণকামী বন্ধু হয়েই পাশে থাকবে। অপসংস্কৃতির ফেরিওয়ালা, কালচাড়াল এলিটদের নোংরা খপ্পার থেকে বের করে নিয়ে এসে সুস্থ জীবনের পথে, প্রকৃত সফলতার পথে পরিচালিত করবে।

যোলো ম্যাগাজিন সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ কবুল করে নিন। আমি যোলো ম্যাগাজিনের বহুল প্রচার ও উন্নয়নের সফলতা কামনা করছি।

ইতি

মুহাম্মাদ এনামুল হোসাইন
লেখক, সোশ্যাল এক্টিভিস্ট।



টিকলিমাডি

লস্ট মডেস্ট

অলাভজনক সংগঠন

প্রকাশিত বইঃ মুক্ত বাতাসের খেঁজে

গভীর MCQ

মনোযোগের সাথে বন্ধুকে
এসে দাঁড়িয়েছেন
কখন যে স্যার পেছনে এসে
বুরাতেই পারিনি। মাথায় একটা গাঁটা খেলাম
হট্টাৎ। ভাবলাম পেছনের বন্ধু মনে হয় MCQ
এর উত্তর জানার জন্য আমাকে ডাকছে। বন্ধুর
ডাকে সাড়া দিয়ে পেছনের বেঁকে একটু হেলান
দিয়ে ফিসফিস করে বললাম- কোনটা পারিস
না জলদি ক। উত্তরে গালে একটা চড় খেলাম।
এবার ভয় পেয়ে গেলাম। দোষ্ট আর যাই করক
চড় মারবে না তো। তাহলে? নিশ্চয়ই স্যার!

ঘাড় ঘুরে তাকাতেই দেখলাম মোটা ক্রেমের
চশমা পরা সুর্দৰ্ণ এক স্যার আমার দিকে
তাকিয়ে মিচিমিটি হাসছে। খাসা ভিলেনি হাসি।

খুব জনসেবা হচ্ছে, না? এই বলে স্যার আমার
খাতা নিয়ে নিলেন। ssc পরীক্ষা। এইসময় খাতা
নিলে যতটা ভয় পাবার কথা ততটা পেলাম না।
কারণ আমার সব দাগানো হয়ে গেছে। আর
এভাবে খাতা হারানো আমার কাছে ডালভাত।

আসলে জানেন কী, আমার মন্টা খুব নরম।
কেউ কোনো বিপদে পড়লে, সাহায্য চাইলে
আমি না করতে পারি না। আমার বন্ধু, আমার
ক্লাসমেইট... একইসাথে ক্লাস করি, খাই-দাই-
ঘুরি, পাড়ার বিভিন্ন আম গাছে পিকেটিং করি,
গার্লস স্কুলের সামনে রোমিও হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি
(আল্লাহ মাফ করুন) আর তারা পরীক্ষার হলে
সাদা খাতা জমা দিবে, কলম কামড়াতে কামড়াতে
প্রায় খেয়ে ফেলবে এ দৃশ্য আমি কোনোমতেই
সহ্য করতে পারি না। আমার বুক ভেঙ্গে যায়।
চোখে পানি চলে আসে। তাই সবাইকে সমানে
সাহায্য করি।

কোটিং আমার খুব একটা ভালো লাগতো
না। তারপরেও যেতে হতো। কোটিং এর

পরীক্ষাগুলাতে তেমন গার্ড থাকতো না। মন
শাস্তি করে দেখাদেখি করতাম। জনসেবা
করতাম। বন্ধুরা খুশি হয়ে সিংগাড়া, সমুচ্চ
খাওয়াত। মালদার বন্ধুরা পেন্টি কেক, বার্গার,
স্যান্ডউচ ইত্যাদি ফরেন জিনিস খাওয়াত।
আমি অবশ্য খেতে চাইতাম না। না খেলে আবার
তারা কষ্ট পাবে! তাদের কষ্ট আমি কীভাবে সহ্য
করব! আগেই বলেছি আমার মন খুব নরম। তাই
যে যাই দিত তাই খেতাম। সর্বভূক।

ভাসিটিতে উঠার পর জনসেবার পরিসর বাড়ল।
পরীক্ষায় দেখানোর পাশাপাশি যুক্ত করলাম
নতুন সেবা- প্রক্সি দেওয়া। কুমনেটদের সবার
দিন শুরু হতো রাত ১২ টার পরে। মুভি,
সিরিয়াল, ২৯, ভিডিও গেইমস, জানপাথির
সাথে ফোনে কুটুর কুটুর...। এতো ব্যস্ততা আর
দায়িত্ব পালন করে এরা ঘুমাতে যেত ফজরের
আয়ান শুনে।

দয়ামায়াহীন স্যারগুলো আবার ক্লাস দিয়ে রাখত
সকাল ৮ টায়। স্যারেরা এত নিষ্ঠুর। এই অসহায়
ছেলেগুলোকে ৮ টায় ক্লাসে আসতে বলা যুক্তি
হাড়া আর কিছুই নয়। আহা! ছেলেগুলোকে
কি ঘুমানোর সময়ও দিবে না! ওদের দুঃখে
আমি স্থির থাকতে পারলাম না। আবেগী গলায়
কাব্যিক টং এ বললাম- তোরা এটেন্ডেন্স নিয়ে
চিন্তা করিস না... এই আমি বেঁচে থাকতে
তোদের কোনো ভয় নেই।

গণহারে প্রক্সি দিতাম। এক ক্লাসে ৪ / ৫ টাও।

আইডি ২০

- ছি স্যার (স্বর মোটা করে)

আইডি ৪০

- ইয়েস স্যার (স্বর চিকন করে)

আইডি ৫৬

- প্রেজেন্ট স্যার (বুক ফুলিয়ে। কারণ এটাই আমার আইডি।)

আইডি ৭৬

- উপস্থিত স্যার। (খাতার মধ্যে মাথা লুকিয়ে বা বেঞ্চের নিচ থেকে কলম তুলতে তুলতে)

এত জনসেবা করি ভেবেই বোধহয় আল্লাহ একের পর এক রিয়ক পাঠাতে থাকলেন!

বন্ধুদের টাকায় ক্যান্টিনের চা, সিংগাড়া,
পরোটা-ডিম ভাজি, ডিউয়ের কাচের বোতল
থেয়ে থেয়ে আমার ভুঁতি হয়ে গেল!
এভাবেই চলছিল আমার জনসেবা। হাটাং দুইটা
ঘটনা ঘটল। পরপর।

১। আমাদের একটা সেমিস্টারে ভাইভা ছিল
এক কোর্সের। ফাইনালের আগের সপ্তাহে। সেই
স্যারের ভাইভার নিয়ম ছিল ক্লাস নোট নিয়ে
ভাইভা দিতে যেতে হবে।

আমি সুন্দর করে নোট করে রেখেছিলাম। কিন্তু
আমার খাতাটা একজন টেবিলের ওপর থেকে
নিয়ে যায়। আমি রুমে ছিলাম না সে সময়। পরে
আর ফেরত দেয়নি। আমিও খুঁজে পাইনি।
তো, ভাইভা কীভাবে দিব সেই চিন্তা করছিলাম।
এমন সময় পাশের রুমের বন্ধু বলল- দোষ্ট,
চিন্তা করিস না, তুই আমার খাতা নিয়ে যাস।

তার ভাইভা ছিল সকালে। আমারটা কিছু
পরে। সে ভাইভা দিয়ে আসলো। আমি গেলাম
ওর খাতা নিয়ে। তন্ম তন্ম করে খুঁজে দেখলাম
কোথাও ওর নাম লেখা আছে কিনা। নেই।
তারপরেও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে তার খাতার
কাভার খুলে ফেললাম।

স্যার খাতা উলটাচ্ছেন আর ভাইভা নিচ্ছেন।
মোটামুটি পারছি। স্যার আমাকে এরই মধ্যে বেশ
কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলেন- এটা কি তোমার
খাতা? সিউর?

আমি খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রতিবারই
বললাম- ইয়েস স্যার।

হাটাং এক ফেইজে যাবার পর স্যার হংকার দিয়ে
বললেন- এটা কী? এটা তো আমার সিগনেচার।
(স্যার একটা জায়গায় খুব ছোট করে সিগনেচার
দিয়ে রেখেছিলেন)

তুমি কেন আমাকে মিথ্যা বললে? কেন বললে
এটা তোমার খাতা? তোমার মুখে তো দাঁড়ি
দেখছি!

আমার লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গেল। একটা
কথাও বলতে পারলাম না। স্যারকে যে সরি
বলব এটাও মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না। পরের
কয়েকটা দিন শুধু মাথার মধ্যে ঘুরছিল,

**‘তোমার মুখে তো দাঁড়ি দেখছি,
তোমার মুখে তো দাঁড়ি দেখছি’!**

এর ৭ দিন পর ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হলো।
শেষ পরীক্ষার দিন ঘটল আরেকটা ঘটনা। আমি
একটা প্রশ্ন পারছিলাম না। একটা জায়গায়
আটকে ছিলাম। পরীক্ষা হচ্ছিল বিশাল হলুকংমে।
হাটাং কারেন্ট চলে যাওয়াতে রুম অন্ধকার
হয়ে গেল। আমি সুযোগটা কাজে লাগালাম।
কিছুদূরেই আমার এক বন্ধু বসে ছিল। ডাক
দিলাম ওর নাম ধরে.... ওর ঠিক পেছনেই স্যার
দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবছা অন্ধকারে ঠিক খেয়াল
করতে পারিনি। স্যার সঙ্গে সঙ্গে আমার আর ওর
খাতা নিয়ে গেল। ১০ মিনিট পর ফেরত দিল।

আমি এই ১০ মিনিটের মধ্যে ঐ সমস্যাটার সমাধান করে ফেলেছিলাম প্রশ্নপত্রের অপর পৃষ্ঠায়। আমি সব এঙ্গার দিয়ে আসলাম। কিন্তু আমার বন্ধু সব শেষ করতে পারল না। ওর মুখটা কালো হয়ে গেল দুঃখে। আমি এই ঘটনায়ও বেশ নাড়া খেলাম।

বিকালে এক এক করে বাড়ি যাচ্ছিল সবাই হল ছেড়ে। মন খারাপ নিয়ে মাঠের এক কোণায় বকুল গাছের নিচে বসে ছিলাম আমি। নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। ঐ বন্ধুর মন খারাপ করা মুখ আর স্যারের বলা সেই কথাগুলো মাথায় ঘূরছিল- তুমি কেন আমাকে মিথ্যা বললে? কেন বললে এটা তোমার খাতা? তোমার মুখে তো দাঁড়ি দেখছি...!

টিকেট কাটা ছিল বাসের। সময়ও হয়ে আসছে। কিন্তু এতই মন খারাপ হয়ে ছিল, কিছু করতে ইচ্ছা করছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এভাবে কতক্ষণ গেল খেয়াল নেই। ঘাড়ে একটা মৃদু স্পর্শ পেলাম। দেখি মাহমুদ দাঁড়িয়ে আছে আমার পেছনে। কাঁধে ব্যাগ। বাসায় যাচ্ছে। আমার পাশের রুমেই থাকে।

কী রে, বাসায় যাবি না?- জিজ্ঞাসা করল ও।
- কী জানি! হাসি দিয়ে বললাম আমি। আমার সেই হাসিতে হতাশা, দুঃখ সব মিশে ছিল।
- কী হয়েছে? মন খারাপ কেন?
- কিছু না, মন খারাপ কই দেখলি!
- আরে, বল না!

মাহমুদকে বললাম। ভাইভার কথা আর আজকে পরীক্ষার হলের কথাও। সে সব শুনে বলল- দেখ, আ঳াহ মনে হয় তোকে এই পাপ কাজটা থেকে ফেরাতে চাচ্ছেন, তাই হ্যাতো এমনটা করেছেন। দেখ, চিন্তা কর তুই। একটু চিন্তা

করলেই বুঝাতে পারবি- এই যে প্রক্রি দেওয়া, পরীক্ষায় দেখাদেখি করা সেটা পাপ। সেটা প্রতারণা। আ঳াহ চাচ্ছেন না তুই এগুলো করিস। থাক যাইবে... ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে। প্যাটের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে সে উঠে গেল। কিছুদূর যাবার পর আমার দিকে ফিরে হাসিমুখে চিঙ্কার করে বলল- মন খারাপ করিস না। বাড়িতে যা। ছুটি কিন্তু বেশি দিনের না!

আমিও উঠে পড়লাম। রুমে ফিরে আসলাম। ব্যাগ গুছিয়ে ঝাড়ের বেগে বাস ধরার জন্য বের হলাম।

বাসে উঠার পর মাহমুদের কথাগুলো ভাবছিলাম। আসলেই কি প্রক্রি দেওয়া, পরীক্ষায় অন্যদের সাহায্য করা পাপ? চলন্ত বাসে খুব একটা ভালো নেট পাবার সন্তানা নেই। তারপরেও সার্চ দিলাম। কিছু লিংক আসলো। সেগুলোতে অনেক কুরআন-হাদীসের রেফারেন্স দেওয়া। সব পড়ে বুঝালাম যে, হ্যাঁ, মাহমুদের কথাই ঠিক। এগুলো পাপ। প্রতারণা। আমি না বুঝে অনেক পাপ করেছি। শয়তান আমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। পরে একজন আলিমকে জিজ্ঞাসা করলাম। উনিও এমনটাই বললেন। তোমাদের জন্য পুরো বিষয়টি একটু সহজ করে বলি।

ধরো, আমি যখন প্রক্রি দিচ্ছি তখন আসলে হচ্ছে টা কী?

১। আমি মিথ্যা কথা বলছি। আমার আইডি ৩০ না, কিন্তু স্যারকে বলছি যে, আমার আইডি ৩০।

২। আমি প্রতারণা করছি। স্যারদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছি।

৩। আমি প্রক্রি দিচ্ছি বলেই আমার বন্ধুরা এটেডেন্সের নম্বর পাচ্ছে। এটা তাদের জন্য হালাল হচ্ছে না। কারণ, তারা তো আসলে ক্লাসে আসেনি।

৪। আমি প্রক্ষি দিচ্ছি। এর ফলে বন্ধুরা এটেডেন্সের নম্বর হারানোর ভয় করছে না। তারা এই সুযোগে রাত জেগে বিভিন্ন পাপের কাজে লিপ্ত হচ্ছে। তারা পাপ করছে। পাপের সাময়িক মজা পাচ্ছে। কিন্তু আমি সেই সাময়িক মজাটুকুও পাচ্ছি না। কিন্তু আমাকে তাদের পাপের ভাগীদার হওয়া লাগছে। আল্লাহর কথার অবাধ্য হচ্ছি।

‘সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কোরো না। আল্লাহকে ডর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।’^[১]

সামান্য ৫ মার্ক ছাড়তে পারি না, ৫ লাখ টাকা ছেড়ে দেব- এমন আত্মবিশ্বাসী হওয়া ভালো না।

পরীক্ষায় দেখাদেখি করে লেখার সময় আমি কী কী করছি—

১। আমি প্রতারণা করছি। আমি যে প্রশ্নের উত্তর জানি না সেই প্রশ্নের উত্তর লিখছি। এতে স্যার ভাবছেন, আমি সেই প্রশ্নের উত্তর জানি। স্যারদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছি।

২। আমি বন্ধুদের দেখাচ্ছি। সে ভালো রেসাল্ট করছে। ভালো নম্বর পাচ্ছে। কিন্তু সে তো ভালো রেসাল্টের যোগ্য ছিল না। প্রতারণার মাধ্যমে এমন করল।

৩। আমি বন্ধুদের পরীক্ষার খাতায় দেখাব, তারা ভালো নম্বর পাবে... এই আশায় তারা পড়াশোনায় অবহেলা করে। এর ফলে ভালো রেসাল্ট নিয়ে বের হলেও তেমন যোগ্যতা অর্জন হয় না। কর্মক্ষেত্রে গেলে সে বিভিন্ন সমস্যার

[১] সূরা মুমিন, ৫ : ২

সম্মুক্ষীণ হবে। জাতি তার সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

আর এই প্রক্ষি দেওয়া, পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করা- এগুলো আমি বন্ধুদের উপকার করার মানসিকতা থেকে করলেও দিনশেষে আমার বন্ধুদের ক্ষতিই করছি।

এখন এই মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, অসততা, অন্যের ক্ষতি করা এগুলোর ব্যাপারে কুরআন, হাদিসের কী বক্তব্য?

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সুপথ প্রদর্শন করেন না।^[২] মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন,

‘মিথ্যা থেকে দূরে থাকো। কারণ, মিথ্যা উপনীত করে পাপাচারে। আর পাপাচার উপনীত করে জাহানামে। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে ও মিথ্যার অঙ্গেয়ায় থাকে, এভাবে একসময় আল্লাহর কাছে সে চরম মিথ্যক হিসেবে লিখিত হয়ে যায়।’^[৩]

প্রতারণার ব্যাপারে মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অন্তর্ধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়; আর যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।’ (মুসলিম)

হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, যেকেনো কাজে-কর্মে প্রতারণা করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তর হাদিসের আওতাভুক্ত। পরীক্ষায় প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টি ও সেগুলোর মধ্যে একটি।

[২] সূরা মুমিন, ৪০ : ২৮

[৩] মুসলিম, ২৬০৭

পরীক্ষায় নকলের ব্যাপারে শাইখ বিন বায রহ. এর ফাতাওয়া:
তিনি বলেন, ‘পরীক্ষায় নকল করা মানুষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতারণার মতোই হারাম ও ন্যাক্কারজনক কাজ। বরং সাধারণ লেনদেনের চেয়ে পরীক্ষায় নকল করা বেশি ভয়ানক হতে পারে। কারণ, নকলের মাধ্যমে সে হয়তো বড় বড় চাকুরি লাভ করবে। সুতরাং, পড়াশোনার সকল ক্ষেত্রে নকলের আশ্রয় নেওয়া হারাম। কারণ, সহীহ হাদিসে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন,

مِنْ غَسْنَةِ فَلَيْسَ مِنَّا

“যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”

তাছাড়া এটি একটি খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা। আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা জেনে-শুনে খিয়ানত কোরো না আল্লাহ ও রাসূলের সাথে এবং খিয়ানত কোরো না নিজেদের পারম্পরিক আমানতের ক্ষেত্রে।”^[৪]

সুতরাং শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক হলো, তারা যেন কোনো পাঠ্যবিষয়েই নকলের আশ্রয় না নেয়। বরং তারা যেন প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করে। যেন তারা বৈধভাবে উত্তীর্ণ হয়।’

অন্যান্য শাইখদের এমন ফাতাওয়া—
<https://tinyurl.com/szmjkrk>
<https://tinyurl.com/btysra7a>
<https://tinyurl.com/836m7pfw>

ভাই দেখো, আমরা দেখাদেখি করে ভালো রেসাল্ট করলেই যে ভালো জব পাব, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। বরং এভাবে দেখাদেখি করার কারণে, নকল করার কারণে আল্লাহ আমাদের ওপর অসম্পত্তি হয়ে আমাদের রিয়ক থেকে বরকত তুলে নিতে পারেন।

‘আর যদি জনপদগুলোর অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতগুলো তাদের ওপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত, তার কারণে আমি তাদের পাকড়াও করলাম।’^[৫]

দেখো ভাই, হারাম কখনো ভালো ফলাফল বয়ে আনে না। হারাম হারাম। তুমি ধরো হারাম কাজ করে ভালো চাকরি পেলে, অনেক টাকা কামায় করলে, কিন্তু দেখবে তোমার অন্তরে শাস্তি নেই। রাতে ঘুম আসে না। ওয়ুধ খেয়ে ঘুমাতে হয়। ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করতে হয়। অথবা দেখবে তোমার ছেলে ফেলি খায়, বাবা খায়, তার বন্ধু-বান্ধব সব হিরোইঞ্চি। অথবা দেখবে তোমার মেয়ে খুব খারাপ কাজ করে বেড়াচ্ছে, তোমার বউ পরবর্তীয়া করছে। হারামের শাস্তি এই দুনিয়াতেই পাবে। এবং আখিরাতে জাহানামের শাস্তি তো তোলায় থাকল।

দেখো ভাই, ছোট ছোট ব্যাপারগুলোতে

[৪] সূরা আনফাল, ৮ : ২৭।

[৫] সূরা আরাফ, ৭ : ৯৬

আঞ্চাহার শুরু মানার মাধ্যমেই আসলে আমরা কঠিন পরীক্ষায় উত্তরে যাবার তরবিয়ত পাই। এখন আমরা ৫ মার্কের লোভ সামলাতে পারছিনা। নকল করছি, দেখাদেখি করছি, প্রম্মি দিছি। কর্মজীবনে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, ৫ লাখ টাকার ঘুঘোর অফার চলে এসেছে। তখন কীভাবে লোভ সামলাব?

সামান্য ৫ মার্ক ছাড়তে পারি না, ৫ লাখ টাকা ছেড়ে দেব- এমন আত্মবিশ্বাসী হওয়া ভালো না। আসো, আঞ্চাহার জন্য এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলোতেও মনোযোগ দিই। কুরবানি দিই। ইনশাআঞ্চাহ, ঈমানের কঠিন পরীক্ষা আসলে আমরা সেই পরীক্ষায় এ প্লাস পেয়ে পাশ করব।

দুইটা ছেলের গল্প বলে এই দীর্ঘ লেখাটা শেষ করছি।

আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে ছিল। সেই ছেলেও একসময় দেখাদেখি করে লেখত শুনেছিলাম। কিন্তু পরে যখন জানল যে, দেখাদেখি করা উচিত নয়, প্রতারণা তখন বাদ দেয়। এরপর আর দেখাদেখি করেনি। এমনকি অনেক সময় সাদা খাতা জমা দিয়েছে। সুযোগ থাকার পরেও দেখেনি। এই ছেলে মাঝারি মানের একটা রেসাল্ট নিয়ে বের হয়। আমি ছিলাম তার পাশের রুমেই। আমাদের সবার আগে এবং অনেক ভালো রেসাল্ট করা ছেলেদের আগেও সে খুব ভালো একটা চাকরি পায়। পাশ করার কিছুদিনের মাঝেই। বউ বাচ্চা নিয়ে ভালোই আছে সে এখন। প্রশান্তিভরা জীবন কঠিনচে। আলহামদুল্লাহ।

দুই নম্বর যে ছেলের কথা বলতে চাচ্ছি, সে ছিল আমাদের স্কুলের। থার্ড বয়। আমাদের প্রি-টেস্ট পরীক্ষা হচ্ছিল রমাদান মাসে। তো, আমাদের শহর জুড়ে সবগুলো কোচিং সেন্টার একটা

অফার দিয়েছিল। কেউ যদি প্রি-টেস্টে সব বিষয়ে এ প্লাস পায় (গোল্ডেন এ প্লাস আরকি) তাহলে সে একদম ফি এসএসসি পরীক্ষার কোচিং করতে পারবে। প্রায় ৩/৪ হাজার টাকা সেইভা। তখনকার সময় এটা অনেক টাকা ছিল। (বাবাকে অবশ্য আমি এই অফারের খবর জানতে দিইনি!)

তো, আমার সেই বন্ধুর সিট পড়েছিল আমার ঠিক পেছনেই। গণিত পরীক্ষা ছিল। তারাবীহ পড়ার কারণে সে পুরো সিলেবাস শেষ করতে পারেনি। আর প্রশ্নও ছিল সেই কঠিন। টেনেটুনে ৮০ তোলাই বিপদ। সে যা এঙ্গার করল তাতে ৭৭/৭৮ পাবে। আর বাকি বিষয়গুলাতে এ প্লাস শিউর। একটা উপপাদ্য নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। ১০ মার্কের। এটা করতে পারলে এ প্লাস শিউর। কিন্তু স্যার এই উপপাদ্য টা বানিয়ে দিয়েছেন। অনেকেই পারেনি স্টেট। আমি আবার ম্যাথে বেশ ভালো ছিলাম (জি, ঠিক ধরেছ, ভাব নিলাম একটু...!)। আমি এটার সমাধান করে ইতোমধ্যেই কয়েকজনকে দেখিয়ে ফেলেছি। তাকেও দেখালাম। সে লেখল। লেখার পর হটাং কী হলো... আমাকে আস্তে করে বলল, না সাওয়ে রেখে আমি এভাবে কপি করব না। এই বলে সে একটানে উত্তর কেটে দিয়ে আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে গেল। ৩/৪ হাজার টাকার লোভ সামলে নিল।

এই ছেলেটাও পরীক্ষাতে দেখাদেখি করত না। কখনো না। ক্লাসের ক্যাপ্টেন ছিল। খুব সৎ। আমার জীবনে দেখা সৎ ছেলেদের একজন। এও বেশ ভালো আছে। ভালো চাকরি করছে। ট্রেনে হটাং একদিন দেখা। খুব কিউট একটা পিচিয়ে বাবা সে এখন।

আশেপাশের মানুষজন আর যাই করুক, যত
প্রলোভনই আসুক, সৎ থাকো ভাই। সততার
কোনো বিকল্প নেই। তোমার কাছে হয়তো
মনে হবে, সৎ থাকলে তুমি পিছিয়ে যাবে।
অসতেরা এগিয়ে যাবে। এটা একদম ভুল ধারণা
ভাই। একদম।

কিন্তু যারা অসৎ হয়, তারা কখনো রেসে জেতে
না। খরগোশের মতো তারা হয়তো এক লাফে
অনেকদূর এগিয়ে যায়। কিন্তু দিনশেষে তাদের
রেস শেষ হয় না। পাপের হতাশা, গ্লানি,
অবসাদ, শাস্তি তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়।
ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। সৎ মানুষেরা কচ্ছপের
গতিতে এগুলেও একমাত্র তাঁরাই পারে রেস
শেষ করতে।

খরগোশ হোয়ো না। কচ্ছপ হও।

“

তুমি ধৈর্য ধারণ করো।
কেননা, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের
প্রতিদান নষ্ট করেন না

”

সূরা হুদ, ১১ : ১১৫

Lone Wayfarer

বদলে যাবার দিনে



আমি ‘এম’। বাসায় মোটামুটি ধরীয় পরিবেশ থাকায় ছোটবেলা থেকেই নেতৃত্বাতার বাউন্ডারির ভেতরেই বড় হয়েছি। লাগামছাড়া উদ্দাম লাইফস্টাইল থেকে গা বাঁচিয়ে গোছানো একটা জীবন যাপন করতাম। ছাত্রজীবনের বেশিরভাগ সময় সহশিক্ষার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকায় প্রেম-টেম করার খুব বেশি সুযোগ কখনো তৈরি হয়নি। সুযোগ আসলেও এসব থেকে স্বত্ত্বে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম।

রাস্তার কোণায় অঙ্ককার চিপায় দাঁড়িয়ে ফোনে ফিসফাস, কথা বলতে বলতে নির্মুম রাত কাটানো, টিউশনির সব টাকা রিচার্জ, গিফট আর ডেটিং এর পেছনে উড়ানো... একদম ব্যক্তিগত আচরণ মনে হতো। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই হারাম সম্পর্কে জড়িত থাকায় ওদের দেখে অনুভব করতে পারতাম, হারাম সম্পর্ক কীভাবে মানুষকে নেতৃত্বাবে দেউলিয়া বানিয়ে দেয়।

কারও সাথে দুই মিনিট কথা বলার পর আমার স্টকে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার মতো আর কোনো টপিক থাকে না। অথবা ঘট্টার পর ঘট্টা বকবকিয়ে যায় অনর্গল! এত্তো এত্তো টপিক কই পায় এরা! ভাবনায় কুলোয়ানি কখনোই।

কঠিনমাফিক গোছানো জীবন্যাপন, সব ঠিক্যাকই ছিল। লেখাপড়ার পাশাপাশি একটা খণ্ডকালীন চাকরিতে প্রবেশ করার পর থেকেই যত বিপন্নির শুরু। অবাধ মেলামেশার জোয়ারে ভেসে গিয়ে খেই হারাতে সময় লাগেনি বেশিদিন। খুব বেশি প্র্যাকটিসিং তখন ছিলাম না। শুধু সালাতটা নিয়মিত আদায় করতাম। এত্তুকুই।

এক মেয়ে কলিগের সাথে জড়িয়ে যাই অল্প

কিছুদিনেই। যেঁচে এসে নানান ঢঙে কথা বলা, এটা ওটা চেয়ে নেয়া, বিভিন্ন রকমের ইঙ্গিত, ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট, ঠুনকো কারণে ইনবক্সে নক দেয়া, ‘দুষ্টুমি’ করে ফোন দেয়া...

আমার দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা নেতৃত্বাতার দেয়াল ভেঙ্গে হারাম সম্পর্কের কাঠামো তৈরি করার জন্য একদম বুলডোজারের মতো কাজ করেছে এগুলো। সরাসরি খুব বেশি কথাবার্তা-মেলামেশা না হলেও ইনবক্সে আলাপের ম্যদু হাওয়া ‘হাই-হ্যালো’র সাগর পেরিয়ে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত বিষয়-আশয় নিয়ে চ্যাটিং এর দিকে গিয়ে গভীর নিম্নচাপের রূপ নিয়ে আরেকটু শক্তি সঞ্চয় করে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় হয়ে আঘাত হেনে সবকিছু ছিন্নবিছিন্ন করে দিতে খুব বেশিদিন সময় নেয়নি। তারপর একদিন চ্যাটে প্ল্যান করে রেস্টুরেন্টে বসা, আইসক্রিম খাওয়া। গাঢ় অঙ্ককারের দিকে যাত্রা শুরু এভাবেই।

অপর পাশ থেকে প্রলুক্ত করার নানান রঙের চেষ্টার মধ্যেও এই আকর্ষণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করিনি। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে শয়তানের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে শ্রোতের বিরুদ্ধে আর কতক্ষণই বা সংগ্রাম করা যায়? শুভ পোশাকে কাদায় নাচতে নেমে আপনি কতক্ষণই বা কাপড়ের শুভতা রক্ষা করতে পারবেন?

“‘এম’, তুমি তো এমন না! এগুলো তোমার জন্য না, তোমার সাথে যায় না এসব!”, “দেখো, তুমি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, এ ধনীর দুলালি তোমার জন্য না। পরে কষ্ট পাবা অনেক”, “আল্লাহকে ভয় করো, তুমি ধরীয় শিক্ষায় শিক্ষিত একটা ছেলে। তোমার মূল্যবোধের সাথে, তোমার ব্যক্তিত্বের সাথে এটা কোনোভাবেই যায় না, তোমার উচিত হবে না

এই ফাঁদে পা দেয়া।” নিজেই নিজের অভিভাবক হয়ে নিজেকে উপদেশ দিচ্ছিলাম অনবরত। কেন আমার এই হারাম সম্পর্কে জড়ানো উচিত না, এই টপিকে নোট লিখতাম ফোনে। সালাতের পর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতাম। হারাম সম্পর্কে না জড়ানোর পক্ষে শতটা কারণ প্রস্তুত ছিল। বিবেককে ঠিক্কাক ভাবে কাজে লাগানোর সব চেষ্টাই করেছি। অন্ধ আবেগ আমার সব চেষ্টাই প্রাপ্ত করে নিয়েছে কিছুতেই শেষ রক্ষা হয়নি।

হবে কীভাবে? সারারাত নিজের সাথে সংগ্রাম করে, নিজেকে শাসন করে দিনের বেলা তো সেই ফাঁদের মায়াজালেই নিজেকে সঁপে দিচ্ছি। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে ফ্রি-মিঞ্জিংওয়ালা পরিবেশে ঢাকারি করছি, দৃষ্টি হিফায়তের বালাই নেই, ফ্রেন্ডলিস্টে জায়গা দিচ্ছি, মেসেঞ্জারে চ্যাট করছি, একই সাথে হারাম সম্পর্ক থেকেও বাঁচতে চাইছি। কীভাবে সন্তুষ্ট?

হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে এটা ছিল প্রতিনিয়ত নিজের সাথে একটা যুদ্ধ। ঘুম ভাঙলেই বুক কেঁপে উঠত। প্রচন্ড খারাপলাগা ঘিরে ধরত। দিন গড়াতে গড়াতে অবশ্য সব ঠিক্কাক।

‘কাছে আসা’র সেই চিরাচরিত নিয়মে চলছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ্যাট, বরে যেত ইমোজির বন্যা-স্টিকারের নহর! গভীর রাত পর্যন্ত ফোনে ফিসফাস, ডেটিং এ যাওয়া। বদলে গিয়েছিলাম খুব। যেই আমি রাত দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে যেতাম, সেই আমি রাত তিনটায়ও সজাগ। সন্ধ্যার পর টিউশনি সেরে রাস্তার চিপায় দাঁড়িয়ে নিচুম্বরে ফোনে কথা বলাটা, পথচারিদের কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টির দিকে গা না করে চালিয়ে যাচ্ছিলাম ঝুঁটিনমাফিক। টিউশনিতে ফোন ব্যবহার রীতিমতো অপরাধ গণ্য করতাম। সেই আমিই

টিউশনে বসে চ্যাট করে যাচ্ছি অবলীলায়! সারাক্ষণ ফোন হাতে নিয়ে বসে থাকা, ঘন ঘন বাইরে যাওয়া, ফোনের বিভিন্ন এপে লক দেয়া, জীবন-যাপনে নানান অনিয়ম।

যে আচরণগুলো চরমভাবে ঘৃণা করতাম, ব্যক্তিত্বান্তর পরিচয় মনে করতাম, সেই আচরণগুলোকেই আপন করে নিয়েছিলাম খুব করে। যেন এক অন্য আমি। ব্যক্তিত্ব হারানো, দীমান হারানো, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এক আদর্শ কুপ্রবৃত্তির গোলাম।

মান-অভিমান, খুনশুটি, ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন, এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। অবিরাম এই যিনাকে শয়তান পরবর্তী রূপ দেয়ায় সচেষ্ট হলো এবার।

মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক হতাম, এই আমিই কি সেই আমি? আয়নায় তাকালে নিজেকে চোর চোর মনে হতো। খারাপ কিছু করে ফেললে পরে প্রচন্ড অনুত্তাপ কাজ করত। নফল সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করতাম অনুত্পন্ন হদয়ে। আল্লাহ রক্ষা না করলে একদম খারাপ পর্যায়ের যিনায় লিপ্ত হয়ে যেতাম নিশ্চিত। প্রতিটা হারাম সম্পর্কই একসময় চূড়ান্ত পর্যায়ের যিনার দিকে এগিয়ে যায়। অবাক হয়ে অনুধাবণ করেছিলাম, আল্লাহর অবাধ্যদের শয়তান কীভাবে কুপ্রবৃত্তির দাস বানিয়ে দেয়। আপনি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে একটু ছাড় দিলেই হবে, বাকিটা শয়তান নিজ দায়িত্বে আপনাকে দিয়ে করিয়ে নেবে।

২.

শিক্ষাজীবনের শেষ পর্যায়ে তখন। এই বয়সী মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ ছেলেদের স্বাভাবিক

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়ে সব এলোমেলো হয়ে গেল। সমবয়সী ধনীর কন্যাকে বিয়ে করার যোগ্যতা অর্জনের এক বিশাল চাপ ভারী পাথর হয়ে বুকে চেপে বসেছিল। বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করলে বিভিন্ন কারণেই এটা ছিল শ্রেফ একটা আকাশ-কুসুম পরিকল্পনা। মেয়ের পরিবার থেকেও বিয়ের তোড়জোড়। একা একা এই চাপ নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না কোনোভাবেই। হারানোর ভয়ে একদম চুপসে যেতাম। ভেতরে ভেতরে মরে যাচ্ছিলাম। রাতের ঘূম নাই হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুবন্ধনের কারণ সাথেই শেয়ার করিনি ব্যাপারটা। হারাম সম্পর্কের পুরো ব্যাপারটাই একদম গোপন রেখেছিলাম সবার কাছ থেকে।

বিয়ের পাত্র হিসেবে যোগ্যতর হওয়ার আশায় আগের চাকরি ছেড়ে দিয়ে অমানুষিক খাটুনি আর মানসিক চাপওয়ালা আরও ভালো বেতনের এক চাকরিতে ঢুকলাম। নতুন এক সংগ্রাম। ভোরে বেরিয়ে রাতে বাসায় ফিরতাম। দাঁতে দাঁত চেপে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এর মাঝে মেয়ের হঠাৎ হঠাৎ রহস্যজনক আচরণে ভেতরটা একদম ভেঙেচুরে যেত। দুই দিকের সংগ্রামে একদম ঢিচ্চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছিলাম। গলায় ফাঁস হয়ে আটকে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে।

যাদের কোনো হারাম সম্পর্ক নেই তাদের দেখেই ঈর্ষা লাগত, আহা! কত স্বাধীন ওরা! আগের ‘আমি’ কে মিস করতাম খুউব।

আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে কান্না করতাম আর দুআ করতাম সবকিছু সহজ করে দেয়ার জন্য। তাহাজুদে দাঁড়িয়ে যেতাম, শেষরাতে কান্না করতাম আল্লাহর কাছে। ক্রমাগত আল্লাহর কাছে অসহায় চিত্তে সিজদাবন্ত হতে হতে

নিজের মধ্যে বিশাল একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। বুবাতে পারছিলাম আল্লাহর চরম অবাধ্যতায় লিপ্ত রয়েছি এই সম্পর্কে জড়িয়ে। সর্বক্ষণ একটা অস্বস্তি কাজ করত। আল্লাহর অবাধ্য হতেও বাঁধছিল, আবার ঐ মেয়ের কথা ভাবলেও বুক চিনচিন করে উঠত।

বাসার দিক থেকে নানান রকম প্রেশার সামগ্রাতে হচ্ছিল ওকে। ওদের প্রত্যাশার সাথে আমার স্ট্যাটাসের দূরত্ব তখন আলোকবর্ধ সময়। এই অবস্থায় হালালভাবে ওদের বিয়ের প্রস্তাব দেবার চিন্তা করাটাও চরম দৃঃসাহসিকতা। শুধু আবেগই ছিল সম্ভল, আর কিছুই ছিল না। কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ফোনে কথা বলতে গেলেই বুবাতে পারতাম আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছি। নিজের সাথে অনবরত যুদ্ধে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে তাকদীরের মালিক আল্লাহর কাছেই হাত পাতলাম সাহায্যের আশায়।

ইসতিখারার আমল করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইশার পর বিনয় সহকারে দু'রাকাত সালাত আদায় করে হাত তুললাম। দুআর অর্থটা একদম হাদয়ের ভেতর থেকে অনুভব করে করে মহান আল্লাহর কাছে ভিক্ষা করলাম সেই অনিন্দ্য সুন্দর দুআটি পড়ে—

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কুদরতের সাহায্যে আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা আপনিই শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং আপনি অদ্বিতীয় সম্পর্কে মহাজ্ঞনী।

হে আল্লাহ! এই কাজটি (উদ্দিষ্ট বিষয়টি মনে মনে উল্লেখ করে) যদি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী

আমার দীন, আমার জীবন, আমার ইহকাল এবং পরকালের জন্য কল্যাণকর হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করুন এবং আমার জন্য তা সহজ করে দিন। অতঃপর এতে আমার জন্য বরকত দান করুন।

আর এই কাজটি (উদ্দিষ্ট বিষয়টি মনে মনে উল্লেখ করে) যদি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী আমার দীন, আমার জীবন, আমার ইহকাল এবং পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি তা থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক আমার জন্য সেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন’।^[১]

কী সুন্দর আর প্রশাস্তিদায়ক! আল্লাহ আকবার! অর্থ বুঝে মুখ্যস্ত করলে অন্যরকম প্রশাস্তিদায়ক এক দুআ। অন্যরকম একটা হালকাভাব অনুভব করতাম এই আমলটা করার পর থেকে। উথাল-পাথাল আবেগের জঙ্গল ছাড়িয়ে বিবেককে কাজে লাগাতে পারছিলাম আগের চেয়ে অনেক সুচারুভাবে। আল্লাহর সাথে অন্যরকম একটা নেকট্য অনুভব করছিলাম। যেকোনো দুআ করলেই চোখ ফেঁটে পানি গড়িয়ে পড়ত টপটপ। এরকম পরিবর্তন নিয়ে আবার আল্লাহর অবাধ্যতায় ফিরে যাওয়া আসলেই সন্তুষ্ট ছিল না। আল্লাহ আমার দুআ কবুল করেছিলেন। আমার জন্য উত্তম পছ্টাই নির্ধারণ করেছিলেন আমার রব।

৩.

আস্তে আস্তে যোগাযোগ কমিয়ে দিলাম। ফোনে কথা বা মেসেঞ্জারে যথাসন্তুষ্ট আবেগের ছোঁয়া না রেখে কথা বলতাম। ‘তুমি’ থেকে ‘আপনি’

তে নেমে এসেছিলাম। খুব কষ্ট পেতো এই ব্যবহারে।

এভাবে আস্তে আস্তে যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ করে দিলাম। মেয়ে হয়তোবা ভেবেছিল অভিমান করে আছি। কিছুদিন পরেই ছিল আমার জন্মদিন। উইশ করার জন্য ফোন আসলো, রিসিভ করিনি। মেসেঞ্জারে উইশ আসলো, কোনো রিপ্লাই দিইনি। এসএমএস আসলো, রেসপন্স করিনি। পুরো একটা দিন শত চেষ্টা করেও কোনোরকম সাড়া না পেয়ে একদম পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। তারপর অনেক কল, অনেক মেসেজ, ইনবক্সে অনেক লেখালেখি। আরও অনেক কিছু। কোনো সাড়াই দিইনি। সাড়া দিলে নির্ধারিত আলুথালু আবেগের বাড়ের কাছে মার খেয়ে যেতাম। যেই আমি মেয়েটাকে হারানোর ভয়ে নির্ধূম রাত কাটাতাম সেই আমিই আজ কত নিষ্ঠুর!

মেয়েটা কষ্ট পাচ্ছে, নির্ধূম রাত কাটাচ্ছে, কান্না করছে এসব চিন্তা মাথায় ঢুকতেই দিইনি। নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে চরম পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছিলাম। আমার নিষ্ঠুরতা শয়তানের সাথে, শয়তানের চক্রান্তের বিরুদ্ধে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে কন্ট্রোল করছিলাম আর মাথায় একটা জিনিসই বারবার আনছিলাম,

‘আমি আল্লাহর জন্য সরে আসছি, সরে আসাতেই দুজনের কল্যাণ। আল্লাহ আমার জন্য এরচেয়েও উত্তম প্রতিদান দেবেন।’

যুদ্ধটা একা একাই করেছি, একদম কাউকেই জানাইনি। আল্লাহ যাতে উভয়কেই বুঝার তাওফিক দেন, কষ্ট সহ্য করার শক্তি দেন, হিদায়াত দান করেন, অনবরত এই দুআ করছিলাম সিজদায় পড়ে।

[১] বুখারি, ৭৩৯০

ফেসবুকের সব ছবি, সব ফানি পোস্ট ডিলিট করে দিয়ে প্রোফাইলটাকে একদম সাদামাটা বানিয়ে ফেলেছিলাম একদিনেই। যোগাযোগের কোনো প্রচেষ্টাতেই রেসপন্স করিনি। মেসেঞ্জারে মেসেজ বা এসএমএস আসলে সাথে সাথে ডিলিট করে দিয়েছি। আমার দিক থেকে নৃত্যতম সাড়া আর না পেয়ে, আমি আর সেই আমি নেই বুরাতে পেরে হাল হেঢ়ে দিয়ে কিছুদিন পরই আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। আর কোনোদিন আসেনি। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রাথমিক ঝড় সামলানোর পর আরও কিছু কাজ বাকি ছিল। ফোন নাস্বার, এসএমএস, পুরো ফেসবুক কনভার্সেশন ডিলিট করে দিয়েছিলাম। সব গিফ্ট দান করে দিয়েছিলাম। চিটিগুলো ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দ্রেনে ফেলে দিয়েছিলাম। ফোনে কোনো ছবি রাখতাম না, তাই গ্যালারি ক্লিন করার প্রয়োজন পড়েনি। ওকে এবং ওর সাথে রিলেটেডের ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে মুছে ফেলেছিলাম তাৎক্ষণিকভাবে। ইলক করার প্রয়োজন বোধ করিনি। নিজের ওপর সচেতনভাবেই নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছিলাম।

তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমার সেই ‘আমানুষিক খাটুনি আর মানসিক চাপওয়ালা’ চাকরি নিয়ে। ফিরে গিয়েছি সেই আগের জীবনে। প্রচন্ড চাপ আর ব্যস্ততার মাঝে দুঃখবিলাস করার কোনো সুযোগই হয়ে উঠেনি। চাকরির প্রচন্ড চাপ আর ব্যস্ততা একদম মোক্ষণ ওযুধ হিসেবে কাছ করেছে জীবনের এই সমিক্ষণে।

তারপর জীবনে অনেক পরিবর্তন। রবের দিকে ফেরার রোমাঞ্চকর এক জারি। সেই গল্প আরেকদিন ইনশাআল্লাহ।

সেই যুদ্ধের দুই বছর পর, অনেক অনেক

ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর কাছে প্রতি মোনাজাতে দুআ করি একজন চক্ষুশীলকারীর জন্য, ক্ষমা চাই অতীতের অবাধ্যতার জন্য।

বিংদুঃং অনেকেই হয়তো ভেতরে ভেতরে উসখুস করছেন মেয়েটার কী হলো পরে জানার জন্য! হ্রম, বছরখানেক আগে মেয়েটার বিয়ে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সাবেক সহকর্মীদের সাথে আড়তায় কথা প্রসঙ্গে তথ্যটা জেনেছিলাম।

ফাঁদে আটকা পড়া ভাইবোনদের জন্য কিছু পরামর্শ:

আমরা যারা হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে আছি, একেকজনের রিলেশনের অবস্থা পারিপার্শ্বিকতা অনুসারে একেকরকম। তবে এখানে একটা জিনিস কমন; সেটা হচ্ছে, আমরা ফিরে আসতে চাই। এবং আন্তরিক নিয়ত থাকলে, দৃঢ় সংকল্প থাকলে আমরা ফিরে আসতে পারব ইনশাআল্লাহ। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মনে জোর রাখতে হবে। নিচের পয়েন্টগুলো মাথায় রেখে কাজ করলে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে আশা করি ইনশাআল্লাহ।

১. ‘আমি আল্লাহর জন্য ফিরে আসছি। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে স্থায়ী শান্তি অর্জন কখনো সম্ভব না। আল্লাহ তারচেয়েও উত্তম প্রতিদান আমার জন্য রেখেছেন।’ এই চিন্তাটা অন্তরে একদম গেঁথে ফেলতে হবে। ওপরের কথাগুলো নিঃসন্দেহে চরম সত্য। আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে যে সম্পর্কগুলো গঠিত হয় এগুলোতে চোখের শীতলতা থাকে না, শান্তি থাকে না। ভুবিভুরি প্রমাণ আমাদের আশেপাশেই আছে। হারাম সম্পর্ক থেকে সরে এসে আমার পুরো জীবনটাই বদলে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। হিদয়াতের এই জীবনে অন্যরকম প্রশান্তি। এখন শুধু ভয়ে

ହାରାମ ମ୍ପର୍କ ଥେକେ ବେର ହବାର ଧାପମନ୍ତ୍ର

ଦଶ ଧାପେ ପରିଚାଳନ

 ‘ଆମି ଆଜ୍ଞାହର ଜନ୍ୟ ଫିରେ ଆସାନ୍ତି । ଆଜ୍ଞାହର ଅବାଧ୍ୟ ହେଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଅଜ୍ଞନ କଥନୋ ସନ୍ତ୍ଵନ ନା । ଆଜ୍ଞାହ ତାରଚେଯେତେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଦାନ ଆମାର ଜନ୍ୟ ରେଖେଛେ ।’ ଏହି ଚିନ୍ତାଟା ଅନ୍ତରେ ଏକଦମ ଗେଠେ ଫେଲାତେ ହେବେ ।



Time will heal everything.
ସମୟରେ ସାଥେ ସାଥେ
ସବକିଛୁଇ ଠିକ ହେଯେ ଯାବେ ।

ମନ ଭାଙ୍ଗା ମାସଜିଦ ଭାଙ୍ଗାର ସମାନ’,
‘ବଦ୍ଦୁଆ ପଡ଼ିବେ’, ‘କୋନୋଦିନ ସୁଖୀ ହିବେ
ନା’ ବ୍ଲା ବ୍ଲା ବ୍ଲା ଏବଂ ବାଣୋଯାଟ ଟୋଟକା
ନିଯେ ହାଜିର ହେବେ ଅନେକେଇ । ଏକଦମ ଚୋଥକାନ
ବନ୍ଧ କରେ ଉପେକ୍ଷା କରେ ଯାନ ଏସବ ।



କୋନୋ ଗୁନାହ କରେ ଫେଲିଲେ ସେଟାର ଜନ୍ୟ
ଆନ୍ତରିକଭାବେ ତାତ୍ତ୍ଵକ କରତେ କଥନୋ
ବିଲମ୍ବ କରା ଯାବେ ନା । ଜୀବନେର ସବକ୍ଷେତ୍ରେ
ଏହି କଥା ପ୍ରୟୋଜ ।



ଫିରେ ଆସାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଯାର ପର ବିଦୟାୟୀ
ସାକ୍ଷାତ, ବିଦ୍ୟାୟୀ ମେସେଜ, ବିଦ୍ୟାୟୀ ଆଲାପ
ଏସବ ନା କରାଟା ସବଚେଯେ ଉତ୍ତମ । ଏକଦମ
ବିନା ନୋଟିଶ୍ଯ ସରେ ଆସୁନ ସନ୍ତ୍ଵନ ହଲେ ।

୧

୧୦

୨

୯

୩

୮

୭

୫

୬

ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଯେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଛାଡ଼ି
ଆପନାର ଜନ୍ୟ ରୀତିମତୋ ଅସନ୍ତବ ମନେ ହେଚେ,
ଜାସ୍ଟ ତାହାଜୁଦେ ଦାଡ଼ାନୋର ଅଭ୍ୟାସଟା ରଙ୍ଗ
କରନ୍ତି । ମନେର ବିରଙ୍ଗକେ ଯୁଦ୍ଧ କରା ଅନେକ
ସହଜ ହେଯେ ଯାବେ ଦେଖିବେନ ଇନଶାଆଜ୍ଞାହ ।
ସୂମପାନ, ମାଦକାସତି, ହାରାମ ମ୍ପର୍କର୍ସହ
ଯେକୋନୋ ଧରନେର ଆସତି ଦୂରୀକରଣେ
ତାହାଜୁଦ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ଏକଟା ଇବାଦାତ ।



ପଡ଼ାର କୋନୋ ବିକଳ୍ଲ ନେଇ । ଏହି ଜାରିର
ଜନ୍ୟ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଜନ୍ୟ ମୁହାସ୍ମାଦ
ଏର ଜୀବନୀ, ସାହାବିଦେର ଜୀବନୀ ଏବଂ
ଅନ୍ତର ନରମ ହେଯ ଏମନ ବହି ପଡ଼ିବେ ।

ନିଜେକେ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ ରାଖିବେ ହେବେ । ବ୍ୟକ୍ତତା
ଅନେକ ବଡ଼ ଓସଥ । ନିଜେକେ ବ୍ୟକ୍ତ ରାଖିଲେ
ଶୁଣ୍ଯତା, ଏକାକିତ୍ତ, ବିରହ, ଶୁଭିକାତରତା
ପ୍ରୀତି କରାର ସୁଯୋଗହି ପାବେ ନା ।



ଗାନ୍ ଶୋନା, ମୁଭି-ନାଟକ-ମିଉଜିକ ଡିଡ଼ିଯୋ
ଟୋଟାଲି ବାଦ । ଏଗୁଲୋଓ ଆଜ୍ଞାହର ଅବାଧ୍ୟତା ।
ଅନ୍ତରକେ କଠିନ କରେ ଫେଲିବେ । ଆପନାକେ
ସେହି ହାରାମ ମ୍ପକେଇ ଟେନେ ନିଯେ ଯାବେ ।



ଅପର ପକ୍ଷର ସାଥେ ନିୟମିତ ଦେଖା ହୁଯ,
କଥା ହୁଯ ଏରକମ ମାନୁଷଗୁଲୋକେ ଏଡ଼ିଯେ
ଯେତେ ପାରିଲେଇ ସବଚେଯେ ଭାଲୋ । ଛବି
ମେସେଜ, ଇନବର୍କ୍, ଫୋନ ନାମାର ସବ ଡିଲିଟ
କରେ ଫେଲାତେ ହେବେ ।

ভয়ে একটা দুআই করি—‘হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে দীনের ওপরেই স্থির রেখো’

২. Time will heal everything. সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। ক্লোজ বন্ধুদের যারাই ব্রেকআপ খেয়ে আমার হেল্প চাইতে এসেছে সবাইকে আমি এই কথাটাই সবার আগে বলেছি, এবং সেটাই সত্য হয়েছে পরে। বাড়-ঝঙ্গা কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে শিখেছে সবাই। কারও জীবন কারও জন্য থেমে থাকেনি। সময় সব ক্ষত সারিয়ে দিয়েছে। যার যার পথে সে এগিয়ে গেছে। একজন ব্যক্তিত্বান মানুষের জন্য এটাই আদর্শ পদ্ধতি। সুইসাইড করা বা বিড়িখোর-গাঞ্জখোর হয়ে যাওয়া, স্মৃতি আকঁড়ে পরে থেকে দুঃখবিলাস করা, এগুলো দুর্বল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। ‘ওকে ছাড়া ক্যামনে বাঁচ’ বা ‘ও আমাকে ছাড়া ক্যামনে বাঁচে’ এইসব আবেগী চিন্তাধারা বাদ দিয়ে নিজের পথ ধরুন একদম স্বার্থপরের মতো। এই মানসিকতা ধারণ করতে পারলেই সাময়িক আবেগের ভাঙ্গা ঘাট পেরিয়ে স্থায়ী সুখের বন্দরে নোঙ্গর করতে পারবেন ইনশাঅল্লাহ।

৩. ‘মন ভাঙ্গা মাসজিদ ভাঙ্গার সমান’, ‘বদদুআ পড়বে’, ‘কোনোদিন সুরী হবে না’ ইত্যাদি এসব বানোয়াট টোটকা নিয়ে হাজির হবে অনেকেই। একদম চোখ-কান বন্ধ করে উপেক্ষা করে যান এসব। হারাম থেকে বেরিয়ে আসুন। বাকিটা আল্লাহর হাতে।

হারাম সম্পর্ক থেকে সরে আসবেন এই নিয়ত করার পর সেটা নিয়ে কারও কাছেই পরামর্শের জন্য যাওয়ার দরকার নেই। কুবুদ্দি দিয়ে আপনাকে হারামেই ফিরিয়ে আনবে আবার। এটাই হয় বেশিরভাগ। একা একাই লড়াই চালান। আল্লাহ আছেন সাথে।

৪.কোনো গুনাহ করে ফেললে সেটার জন্য আন্তরিকভাবে তাওবা করতে কখনো বিলম্ব করা যাবে না। জীবনের সবক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। গুনাহ করে তাওবা করলে আল্লাহ সেই গুনাহ থেকে বেরিয়ে আসার পথ সহজ করে দেন। আমরা যারা হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে আছি, আসুন আগে আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করি, ক্ষমা চাই, ফিরে আসার জন্য আন্তরিকভাবে সংকল্প করি।

৫. ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর বিদায়ী সাক্ষাত, বিদায়ী মেসেজ, বিদায়ী আলাপ এসব না করাটা সবচেয়ে উত্তম। একদম বিনা নোটিশে সরে আসুন সন্তুষ্ট হলো। অনেক ভাই শেষবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। সিদ্ধান্ত জানিয়ে মেসেজ দিলেন ঠিক আছে, ফিরতি মেসেজে যে আবেগের ঝাপটা আসবে সেটা সামলে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতি আছে তো? না কি আবেগের ঠ্যালায় আবার ভেসে যাবেন?

৬. ফিরে আসার পর খুব জোরেশোরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে হবে। একদম চিরনি অভিযান যাকে বলে। অপর পক্ষের সাথে নিয়মিত দেখা হয়, কথা হয় এরকম মানুষগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারলেই সবচেয়ে ভালো। ছবি, মেসেজ, ইনবক্স, ফোন নাম্বার সব ডিলিট করে ফেলতে হবে। ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে ছাঁটাই করতে হবে। সব গিফ্ট কাউকে দান করে দিতে হবে, নাহয় ডাটবিনে ফেলতে হবে সোজা। একদম ভাবলেশহীন চিত্তে কাজগুলো সারতে হবে। কোনো অজুহাতে পিছপা হওয়া চলবে না। সামান্যতম চিহ্নও রাখা যাবে না। স্মৃতি মনে পড়ে যাবে এরকম সব ব্যাপার থেকে সতর্ক থাকতে হবে। পরবর্তীতে কোনো মেসেজ, কল

আসলে সাবধানতার সাথে এড়িয়ে যেতে হবে।
স্মৃতি মনে পড়ে গেলেই ইস্তিগফার পড়তে হবে
সাথে সাথে। স্মৃতিগুলোকে পশ্চয় দেয়া যাবে না।

৭. গান শোনা, মুভি-নাটক-মিউজিক ভিডিও
টেটালি বাদ। এগুলোও আল্লাহর অবাধ্যতা।
অন্তরকে কঠিন করে ফেলবে। আপনাকে সেই
হারাম সম্পর্কেই টেনে নিয়ে যাবে। দৃষ্টি হিঁচায়ত
করতে হবে, গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে। তবেই
এই দৃষ্টির শীতলতার ব্যবস্থা করে দেবেন
আল্লাহ। হারাম সম্পর্ক বাদ দেয়ার নিয়ত যে
করতে পারে, তার জন্য এসব ছেড়ে দেয়া কোনো
ব্যাপারই না ইনশাআল্লাহ। ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে সব
নন-মাহরাম ছাঁটাই হবে একদম নির্দয়ের মতো।
ফেসবুকে ‘ভালোবাসার ফুল’, ‘থ্রেমের যন্ত্রনা’
টাইপের যত পেইজ-গ্রুপ আছে সব আনফলো
করে দিতে হবে। থ্রেমের গল্প-উপন্যাস পড়া
বাদ দিতে হবে। ওপরের সব বিষয়ের খুব ভালো
বিকল্প আমাদের আছে। জাস্ট একটু খুঁজে নিতে
হবে। এতটুকুই।

৮. নিজেকে প্রচণ্ড ব্যস্ত রাখতে হবে। ব্যস্ততা
অনেক বড় ওষুধ। নিজেকে ব্যস্ত রাখলে শূন্যতা,
একাকিত্ব, বিরহ, স্মৃতিকাতরতা গ্রাস করার
সুযোগই পাবে না। অবসর, একাকিত্ব এগুলো
আপনাকে তিলে তিলে শেষ করে দেবে। এমন
ব্যস্ত থাকতে হবে যাতে রাতে শোয়া মাত্রই ঘুমের
রাজ্যে হারিয়ে যেতে পারেন। প্রচণ্ড খাটুনিওয়ালা
চাকরিতে ব্যস্ত না থাকলে আমি ফিরে আসতে
পারতাম কি না সেটা নিয়ে আমি খুবই সন্দিহান।
সিরিয়াসলি।

৯. পড়ার কোনো বিকল্প নেই। এই জর্নির জন্য
মানসিক প্রস্তুতির জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী,
সাহাবিদের জীবনী এবং অন্তর নরম হয় এমন
বই পড়তে হবে।

১০. সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মূল্যবান পরামর্শ -

‘নিশ্চয়ই ইবাদাতের জন্য রাতে উঠা প্রবৃত্তি
দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল।’^{১৬}

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,
‘নিশ্চয়ই’। অতএব কুপ্রবৃত্তি দমনে তাহাজ্জুদের
ভূমিকা আশা করি আর খুলে বলতে হবে
নাতারপরও নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতার
আলোকে বলছি, আপাত দ্রষ্টিতে যে অভ্যস্টা
ছাড়া আপনার জন্য রীতিমতো অসম্ভব মনে
হচ্ছে, জাস্ট তাহাজ্জুদে দাঢ়ানোর অভ্যস্টা
রপ্ত করুন। মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনেক
সহজ হয়ে যাবে দেখবেন ইনশাআল্লাহ।
ধূমপান, মাদকাসক্তি, হারাম সম্পর্কসহ
যেকোনো ধরনের আসক্তি দূরীকরণে তাহাজ্জুদ
অনেক কার্যকরী একটা ইবাদাত।

তাহাজ্জুদে দাঢ়ানোর অনুপ্রেরণার জন্য
একটা বই সাজেস্ট করছি, আমার খুবই প্রিয়
একটা বই। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল-এর
'কিয়ামুল লাইল'। ৩০ পঢ়ার ছোট একটা বই,
কিন্তু তাহাজ্জুদের ব্যাপারে অনুপ্রেরণামূলক
আলোচনায় একদম ঠাসা! হারাম সম্পর্ক
নিয়ে যখন সংগ্রাম করছিলাম তখনই হাতে
আসে বইটি। পড়ার পর খুবই অনুপ্রাণিত হই
মাশাআল্লাহ! বইটি পড়ার দিন থেকে তাহাজ্জুদে
দাঢ়ানোকে অভ্যাসে পরিণত করতে আমার
খুব বেশি সময় লাগেনি। তাহাজ্জুদে দাঢ়ানোর
অভ্যাস করার পর থেকে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ
আরও জোরালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

শীতকাল হোক আর গ্রীষ্মকাল হোক,
খাওয়াদাওয়া, ঘৃঘৃ আর শারীরিক সক্রিয়তা

[২] সুরা মুয়াম্বিল, ৭৩ : ৬

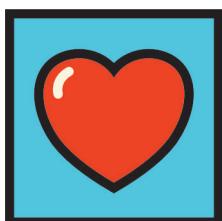
নিয়ে একটু সচেতন হলে, লাইফস্টাইলে একটু ইতিবাচক পরিবর্তন আনলে আর ইম্পাত কঠিন সংকল্প থাকলে তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলাটা মোটেই কঠিন কিছু না। আর তাহাজ্জুদের অভ্যাস যার আছে তার ফজরও মিস হবে না ইনশাআল্লাহ।

তাহাজ্জুদ এবং ফজর আদায় করে শয়তানের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রমে জয়ী হয়ে দিন শুরু করা গেলে দিনের বাকি সময়টাতেও শয়তান বারে বারে পরাজিত হবে ইনশাআল্লাহ।

শেষকথা:

ফিরে আসাটা একদিনের কাজ না। এটা একটা প্রসেস, একটা জার্নি। এই জার্নি শেষ করতে গিয়ে আগের ‘আমি’ আর বর্তমান ‘আমি’ কে অনেক বেশি বদলে ফেলতে হবে। পুরো লাইফস্টাইল চেঙ্গ করে ফেলতে হবে। হারাম সম্পর্ক পরবর্তী মুক্ত-স্বাধীন জীবনটা অনেক শাস্তিময় আলহামদুলিল্লাহ।

হারাম সম্পর্কের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসি চলুন। যে চক্ষুশীতলকারিণী আল্লাহ আমাদের জন্য ঠিক করে রেখেছেন তার যোগ্য হওয়ার জন্য পুরোদমে কাজে লেগে পড়ি চলুন। চারিত্র সংশোধনের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিই চলুন। আল্লাহ আমাদের পথচলা সহজ করে দিন। আমীন।





অতঃপর, হাসনাহেনা হেসেছিল

লস্ট মডেস্ট



১

সোফার উপর স্টান বসে আছি। সামনে গন্তির মুখে বসে আছেন খালুজান। জরুরি তলব করে আনানো হয়েছে আমাকে। যেহেতু জরুরি তলব সেহেতু ঝামেলা কিছু একটা যে আছে সেটা খুব টের পাচ্ছি।

‘খালা, রাহাতকে দেখছি না যে..’

‘দেখবা। ওরে দেখানোর জন্যেই ডাকছি তোমাকে।’ গোমড়ামুখেই খালুজানের উভর। খালা নিশ্চৃপ।

রাহাত হলো আমার একমাত্র খালাত ভাই। বাপ-মায়ের আদরের দুলাল। ছোট বড় কোনো আবদ্ধারই ওর অপূর্ণ রাখেন না খালা-খালুজান।

যে কেউ হয়তো ভেবে বসতে পারে- আদর পেয়ে বথে যাওয়া কোনো ছেলেই হবে বোধহয়!

কিন্তু না, আর দশটা ছেলের মতো নয় রাহাত। বেশ ব্রিলিয়ান্ট। জেএসসি তে ওদের স্কুলের হাইয়েস্ট মার্কস পেয়ে সরকারি স্কুলার্শিপও বাগিয়ে নিয়েছে।

ওকে নিয়ে তো কোনো ঝামেলা হবার কথা না। কাহিনিটা কী?

২

‘দরজা খোল, ব্যটা! আমি তোর মাসুদ ভাই..’

মিনিট খানেক পরে দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে দিয়েই রাহাত খাটের ওপর গিয়ে বসেছে। মাথা নিচু।

‘কী বে! এতদিন পরে এলাম। কেমন আছি না আছি - কিছু তো বলবি না কি?!’

মাথা তোলার পর সবার আগে নজরে এল চোখজোড়া। কত রাত ঘুমায় না কে জানে!

পাশে বসতে বসতে পিঠে হাত রাখতেই বুবলাম গায়ে হালকা জুর।

‘কীসব কাণ্ড করিস বল তো! বাপ মায়ের ওপর কেউ রাগ করে? উন্নারা তোকে কত ভালোবাসেন।

সামান্য ভিডিয়ো গেমস নিয়ে এন্ট রাগ!

সমস্যার আদ্যোপাস্ত খালা বলেছে আমাকে। জেএসসির পরে একটা ট্যাব কিনে দিতে বলেছিল রাহাত। ছেলের ভালো রেসাল্টের বিপরীতে এই আবদ্ধার ফেলার কোনো সুযোগই ছিল না। খালুজান একটু গাইগুই করলেও পরে আর ‘না’ করেননি। ছেলে খুশি তো তারাও খুশি!

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল দিন কয়েক বাদে।

ডিভাইস পেয়ে ছেলে তো নাওয়া-খাওয়া ভুলবার জোগাড়। সারাদিন ওসব নিয়ে পড়ে থাকে নিজের কুমো। পাগলের মতো অবস্থা।

পড়াশুনাও শিকেয় উঠেছে। মিডটার্ম পরীক্ষায় নাকি অঙ্গের জন্য বেঁচে গেছে। ফিজিঙ্গে পেয়েছে ৪৪! আনন্দিতভেবল!

গতরাতে খালুজান খেতে বসে ডাকাডাকি করেও ওকে যখন টেবিলে আনতে পারলেন না, তখন উঠে গিয়ে ট্যাব-টাই কেড়ে নিলেন। সাথে সাথে ওটা চলে গেল লকারে। বোনাস হিসেবে বাসার

ওয়াই-ফাই লাইন বন্ধ!

তুমুল কাণ্ড।

রাহাতও কম যায় না। চিৎকার চেঁচামেচি করে
শেষে না খেয়েই ঘরে খিল দিয়ে আছে কাল
থেকে। বন্ধ দরজা খুলল আমি আসার পর।

‘চল, উঠ! বাইরে খেতে যাব। তোর সাথে
অনেকদিন বাইরে খাই না।’

হাত ধরে টেনে তুলে ওয়াশরুমে পাঠ্যালাম
অভিমানী ভাইটাকে।

৩

খাবারের অর্ডার দিয়ে রাহাতকে বললাম,

‘তোর বাগানের কী খবর বল তো.. সেই যে
খুঁজে খুঁজে কোথেকে কী একটা ফুল এনেছিলি
না? কী যেন নাম?’

‘হাসনাহেনো। মরে গেছে বোধহয়, ভাইয়া। জানি
না আমি। ছাদে যাওয়া হয় না অনেকদিন। ওসব
আর ভাঙ্গাগে না।’

‘বলিস কী! এত শখ করে করলি সব। এখন
বলছিস ভাঙ্গাগে না।’

বার্গার চলে এসেছে, লাচ্চি আসতে একটু দেরি
হবে বলল। হোক, আমার হাতে অফুরন্ট সময়।
তাছাড়া এরা লাচ্চিটা বানায় একদম পার্ফেক্ট।
সোজা বাংলায়- অসাধারণ!

‘নে- শুরু কর। বিসমিল্লাহ..

আচ্ছা, আমাকে বল তো, দিনে এভাবেজ

কতক্ষণ গেম খেলে কাটাস তুই?’

‘উনম.. কতই বা আর হবে.. আধ ঘণ্টা,
বড়জোর এক ঘণ্টা.. এর বেশি তো না!’

আমতা আমতা করে বলল রাহাত। অথচ খালা
আমাকে বলেছে, ও নাকি দিনের ম্যাঞ্জিমাম
টাইম-ই ডিভাইস নিয়ে পড়ে থাকে। মাঝে তো
স্কুলও কামাই দিয়েছে ক’দিন!

রাহাত যে এভাবে আমার কাছে মিথ্যে বলবে
সেটা আমি আশা করিনি। কিছুটা রাগ হলেও
আপাতত সামলে নিলাম।

‘তুই কি জানিস একটা নিরীহ অভ্যেস কিন্তু
আসক্তি হয়ে উঠতে পারে? এবং সেটা তখন
আর মোটেই নিরীহ থাকে না। বরং খুবই বাজে
একটা ব্যপার হয়ে দাঁড়ায়।

আমার ক্যাম্পাসের এক বড় ভাইয়ের গল্ল শোন।
দিনে দুই প্যাকেট সিগারেট ছাড়া তার চলেই না।
একদম হিসেব করা। কোনোদিন যদি একটাও
কম হয় সেদিন নাকি তার সকালের কাজটা
ক্লিয়ার হয় না! চিন্তা কর অবস্থা!’

রাহাত ফিক করে হেসে ফেলল। এই ছেলের
হাসিতে একটা আশ্চর্য মায়া আছে। আগে কখনো
খেয়াল করিনি।

‘কী আজব! সিগারেটের সাথে ট্যালেটের সম্পর্ক
কী?’

‘এটাই তো কথা, এটা তার সাইকেলজিক্যাল
সমস্যা। আসক্তি এতটাই ভয়ংকর। অথচ মজার
ব্যপার হলো, তার শুরুটাও ছিল সপ্তাহে একটা
সিগারেট দিয়ে, তাও আবার বন্ধুরটা শেয়ার

করে।

গেমসের ব্যপারটাও তা-ই। ধরে নিলাম তুই খুব
কম সময়ই খেলিস। আসক্তি না, শখ। কিন্তু এটা
যদি আসক্তির পর্যায়ে চলে যায়, সেটা কি খুব
ভালো কিছু হবে? খারাপ হবে না?’

রাহাত মাথা নেড়ে শুধু বলল, ‘হ্যাঁ’

‘আচ্ছা, তুই আমাকে বল তো, কী করে বুবাবি
যে ব্যপারটা ‘আসক্তি’ পর্যায়ে চলে গেল কি
না?’

‘কী করে?’ বার্গার মুখে দিতে দিতে পালটা প্রশ্ন
রাহাতের।

‘বলছি শোন...

কিছু সিম্পটমস, মানে লক্ষণ দেখার মাধ্যমে খুব
সহজেই বুঝতে পারবি ব্যপারটা। যেমন ধর-
অতিমাত্রায় খেলতে ইচ্ছে করবে। না খেলতে
পারলে ভেতরে ভেতরে অস্পষ্টি লাগবে। কিছুই
ভালো লাগবে না।

রাত জেগে খেলার অভ্যেস তৈরি হবে। না
ঘুমিয়েই রাত কেটে যাবে পুরো রাত। ফলে
সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব থেকেই যাবে। কাজে মন
দিতে পারবে না।

দিন-রাত পার করে দিবে গেমস খেলে কিন্তু
কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে- মাত্রই তো ফোনটা
নিলাম, আধা ঘণ্টা খেলেছি খালি! গেমস
নিয়ে মিথ্যে বলার হার বেড়ে যাবে। দৈনন্দিন
কাজকর্মগুলোও সময়মতো করবে না। এমনকি
অনেকের তো খাবার কথাও মাথায় থাকে না।
খেলেও খাবে একাকী। সবার সাথে খাবে না।
দেখা গেল এক হাতে খাচ্ছে, অন্য হাতে গেমস।
একা থাকতেই বেশি পছন্দ করবে। সামাজিক
অনুষ্ঠানগুলো এড়িয়ে যাবে।

খেলার সময় কেউ কোনো দরকারি প্রয়োজনে
ডাকলেও মেজাজ বিগড়ে যাবে।

পড়াশোনার প্রতি বিত্তৰ্ণ জন্ম নিতে শুরু
করবে। একসময় যে কাজগুলো সে ভালোবেসে

করত, সেসব কাজও তখন পানসে মনে হবে।

ক্রিয়েটিভিটি (সৃষ্টিশীলতা) করতে থাকবে।

এগুলো একদম সাধারণ কিছু লক্ষণ। আরও
অনেক আছে। সেসব না হয় থাক। তোর সাথে
কিছু মিলে গেল কি না তা-ই বল।’

এর মধ্যে কখন যেন ওয়েটার এসে লাঞ্ছি দিয়ে
গেছে। আমি কথার ফাঁকে খেয়াল-ই করিনি।

বার্গার শেষ করে বরফ দেয়া লাঞ্ছিতে চুম্বক
দিচ্ছে রাহাত। একটু থেমে বলল-

‘সব না, তবে কয়েকটা মিলেছে।’

‘আচ্ছা! আচ্ছা!’

হঠাৎ রেস্টুরেন্টের ডান পাশের এক রাস্তায়
গোলমাল দেখা দিল।

‘ভাই, একটু...’

রাহাত উঠে গিয়ে জানালা থেকে ঘুরে আসল,
মুখটা একটু থমথমে। ‘এক রিকশার সাথে
সাইকেল বেঁধে গিয়েছে’, এসে আমাকে জানাল
রাহাত।

কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা-

‘তোর বোধহয় চশমা নিতে হবে বে। চোখের তো
বারোটা বাজিয়ে ফেলেছিস!

আমি তো এখানে বসেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
যে, কী কাহিনি ঘটেছে। তোর উঠে গিয়ে দেখতে
হলো।’

রাহাতের মুখটা যেন আরও মলিন হয়ে গেল।

কৃত্রিম রাগী সুরে বললাম-

‘রাত দুপুর সারাক্ষণ ক্রিনে ডুবে ডুবে গেমসে
“অ্যাটাক” দিয়ে বেড়াস, আর এদিকে তোর
শরীরেই অলরেডি অ্যাটাক শুরু হয়ে গেছে।
আজ চোখ গেছে, কাল মাথা যাবে।’

‘ধূর, ভাই! এখন আবার বইল না যে, গেইম
খেলতে খেলতে পাগল হয়ে যাব..’

‘তো যাবিই তো। পাগল হয়তো হবি না, বাট
মানসিক সমস্যায় তো পড়বিই যা ‘Gaming
Disorder’ নামে পরিচিত।’

ରାହାତେର ଚୋଖେ ମୁଖେ ଖାନିକଟା ଅବିଶ୍ଵାସେର ଛାୟା। ତବେ ଆମାର ପ୍ରତି ଓର ସୁଧାରଣା ଏତଟାଇ ପ୍ରକଟ ଯେ, ଠିକ ଅବିଶ୍ଵାସଙ୍ଗ କରତେ ପାରଛେ ନା।

ଭାସ୍ତିର ଛାୟା ଦୂରେ ସରିଯେ ଦିତେ ଫୋନ୍ଟା ବେର କରେ ତଥନୀୟ ଗୁଗଳ କରେ ଓକେ ଦେଖଲାମ-

‘ନେ! ଦେଖ..’

ବେଶ କରେକଟା ଆଟିକେଳ ଘୁରେ ଘୁରେ ଦେଖା ଶେମେ ହତାଶ ଛେଲେଟାକେ ବଲଲାମ-

‘ତାହଲେ କୀ ବୁଝାଲି ବଲ ତୋ? କତଟା କ୍ଷତି ଆର କତଟା ଲାଭ?

ଆଜ୍ଞା, ଆମି ସାମାଜାଇଜ କବି, ଶୋନ..

ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି:

ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ, ଘୁମେର ସମସ୍ୟା, କ୍ଲାସ୍ତି, ଖାଓୟା ଅରୁଚି।

ମାନସିକ କ୍ଷତି:

ମେଜାଜ ତିରିକ୍ଷି, ଅତିରିକ୍ଷ ଚାପ, ସାଥେ ପାରିବା-ରିକ ଆର ସାମାଜିକ କ୍ଷତି ତୋ ଆହେଇ।

ସମୟ ନଷ୍ଟ, ଟାକା ନଷ୍ଟ, ପଡ଼ାଶ୍ରନା-କ୍ୟାରିଆର ନଷ୍ଟ! ଆଲିମଗଗ ତୋ ଏସବ ଗେଇମକେ ନାଜାଯିଯ ବଲେଛେନ। ଗେମକେ ନାଜାଯିଯ ବଲେ ଫାତାଓୟା ଦିଯେଛେନ। ଅତଏବ, ଇସଲାମିକ ଦିକ ବିବେଚନ କରଲେଓ ଏସବ ଗେମସ ହଲୋ ‘ଲସ ପ୍ରାଜେସ୍ଟ’।

ଜୀବନଟାକେ ନଷ୍ଟ କରାର ସବ ଉପାଦାନ ଏଖାନେ ଏକସାଥେ ଏକେର ଭେତର ସବ। ଆର ବିନିମୟେ ଲାଭେର ଖାତାଯ କିଛୁ ହାସ୍ୟକର ସୁଖାନୁଭୂତି ଛାଡ଼ି କିଛୁଇ ନେଇ। ତୋର ମତୋ ବିଲିଯାନ୍ଟ ଛେଲେ ଏଇ ନୋଂରା ଜଲେ ଭେସେ ଯାବେ, ଏଟାଓ ଆମାକେ ମାନତେ ହବେ?’

‘ସ୍ୟାର, ଆର କିଛୁ ଲାଗବେ?’

‘ନା ଭାଇୟା, ଥ୍ୟାଂକସ! ବିଲଟା ଦିନ।’

ବିଲ ପେ କରେ ରେସ୍ଟୁରେନ୍ଟ ଥେକେ ବେରିଯେ ରିକଶା ନିଲାମ। ରାହାତ କିଛୁ ବଲଛେ ନା। ହ୍ୟାତେ ନିଜେର

ମନେର ସାଥେ ବୋବାପଡ଼ା କରଛେ। ଅଥବା କେ ଜାନେ କତ ମାସ ପରେ ହ୍ୟାତେ ମୁକ୍ତ ବାତାସେ ମନ ଭରେ ଏକଟୁ ଶ୍ଵାସ ନିଚ୍ଛେ। ନିତେ ଥାକୁକ।

8

ରାହାତ ଯଥନ କଲ ଦିଯେଛିଲ ଆମି ତଥନ ଭାର୍ସିଟିର ଲ୍ୟାବେ। ତୋଫାଙ୍ଗଜଳ ସ୍ୟାରେର କ୍ଲାସ। କଲ ରିସିଭ କରାର କୋନୋ ଜୋ ଛିଲ ନା।

କ୍ଲାସ ଶେଯେ କଲ ବ୍ୟାକ କରତେ ଫୋନ ଖୁଲେ ଦେଖି ରାହାତେର ଛୋଟ ମେସେଜ-

‘ମାସୁଦ ଭାଇ!

ହାସନାହେନା ଗାଛେ ନତୁନ ଫୁଲ ଏସେଛେ। ଯା ସୁନ୍ଦର ଘାଗ ଛାୟା! ଆମି ତୋ ଏଖନ ଛାଦେଇ ଟଂ ଏର ମତୋ ବସାର ଜାୟଗା ବାନିଯେ ନିଯେଛି। ଓଖାନେଇ ପଡ଼ି।

ତୁମି ଯଦି ଏବାର ବାସାଯ ଆସୋ, ତାହଲେ ତୋ ଆର ଯେତେଇ ଚାଇବେ ନା!

ଓହ.. ଆର, ଟ୍ୟାବଟା ବାବାକେ ବଲେ ଅନଲାଇନେ ବିକ୍ରି କରେ ଦିଯେଛି। ଆପାତତ ଆମାର ଓସବ ଲାଗଛେ ନା। ବିକ୍ରିର ଟାକା କୀ କରେଛି ଜାନୋ?

ବଇ କିନେଛି! ଏ ଯେ ତୁମି ଏକବାର ଏକଟା ଲିସ୍ଟ ଦିଯେଛିଲେ ଯେ.. ଲିସ୍ଟ ଧରେ ଧରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇୟା, ନତୁନ ବହି ଆର ହାସନାହେନା କୋନଟାର ଘାଗ ବେଶି ସୁନ୍ଦର?

ଏକଦମେ ପୁରୋ ମେସେଜଟା ପଡ଼େ ନିଲାମ। ବୁକେର ଭେତର ଥେକେ କେମନ ଏକଟା ଅନ୍ତୁତ ପ୍ରାଚୀନ ବାତାସ ଶିରଶିର ବେରିଯେ ଏଲା। କେନ ଯେନ ଏକଟୁ ଶବ୍ଦ କରେଇ ବଲେ ଫେଲଲାମ- ଆଲହାମଦୁଲିଙ୍ଗାତ!

ତଥସୁତ୍ରଃ

1. What are the Signs of Video Game Addiction?- <https://tinyurl.com/rsbhkw>

2. Inclusion of “gaming disorder” in ICD-11- <https://tinyurl.com/ppdpbtjj>

3. Game Theory: The Effects of Video Games on the Brain- <https://tinyurl.com/8vbjwzca>

ফড়িং

তানযিল আমীন শুভ

আমি মিশে রবো যমুনার কালো জলে,
আমি ছুটে বেড়াব বিল ভর্তি শাপলাদের দলে,
কখনো আমি দক্ষিণা বাতাস হব
ছুঁয়ে যাব বান্ বান্ বান্ বান্ জনশূন্য রেললাইন।
কখনো আমি পথিকের চোখ জুড়ানো পথ হব
না হয় পথের ধারের গাছ হব
হব শেওলা ধরা দেয়ালের ধারে ফুটে থাকা বুনো টগর ফুল,
কখনো পুকুর ধারের কদম গাছ হব,
কখনো হব খেয়াঘাটের বকুল তলায় চকচকে পানিতে ঝারে পড়া বকুল ফুল।

কখনো আমি একটা ঘূড়ি হব
মেঘের পাহাড়ে ভেসে বেড়াব,
এক ভোরে আমি সূর্য উঠা দোয়েল হব,
সুযোগ পেলে পানির তলার মাছ হব,
না হয় একটা রাখাল হব
ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠের পরে মাঠ চড়ে বেড়াব।
এসব কিছু না হতে পারলে
না হয় একটা ফড়িং-ই হব
মুক্ত বাতাসে ডানা মেলে যেদিক খুশি উড়ে বেড়াব।

”

চলো গল্প শুনি

আসিফ আদনান
লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক

সেই মানুষটার গল্প বলি। হয়তো আগে
শুনেছ, তবুও আবার বলি। সেই দিনের কথা
বলি যা এখনো আসেনি, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই
আসবে। সেই সময়টার কথা বলি, যা তুমি ভুলে
গেছ। কিন্তু অবধারিতভাবে যা তোমাকে গ্রাস
করবে।

পুনরুত্থানের দিন। জড়ো করা হয়েছে পূর্ববর্তী
ও পরবর্তীদের। মানবজাতি অসহায়, সন্ত্রস্ত,
অপেক্ষমান। চিন্তিত, অস্থির, অক্ষম। সেইদিন
মানুষ তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য আর্জি
নিয়ে দুনিয়ার রাজাদের কাছে যাবে না। দুনিয়ার
শাসকদের কাছে যাবে না। তারা ছুটে যাবে আল-
আস্মিয়ার (নবিদের) কাছে – আলাইহিমুস
সালাতু ওয়াস সালাম।

মানুষ প্রথম ছুটে যাবে মানবজাতির পিতা
আদমের কাছে, আলাইহিস সালাতু ওয়াস
সালাম। তারা আদম আলাইহিস সালাম-এর
কাছে গিয়ে বলবে...

‘হে আদম, আপনি কি মানুষের অবস্থা দেখছেন না? অথচ আল্লাহ আপনাকে নিজের বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে তিনি তাঁর ফেরেশতাগণ দিয়ে সিজদাহ করিয়েছেন। আর আপনাকে সব জিনিসের নাম শিখিয়েছেন। কাজেই আপনি আমাদের রবের কাছে সুপারিশ করুন, যেন এ স্থান থেকে আমাদেরকে তিনি স্বাস্থ্য দেন।’

আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলবেন - এ কাজের জন্য আমি উপযুক্ত নই। আমাদের পিতা আদম নিজের ভুলের কথা স্মরণ করবেন এবং মানুষকে বলবেন মানবজাতির প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল নৃহ-এর কাছে যেতে, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।

তারা নৃহ আলাইহিস সালাম-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর কৃত ভুলের কথা স্মরণ করবেন, এবং মানুষকে বলবেন আল্লাহর খলীল ইবরাহীমের কাছে যেতে, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।

তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর কাছে যাবে। তিনিও তাদের কাছে স্বীয় ভুলের কথা উল্লেখ করে বলবেন- আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মূসার কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ তাওরাত দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে তিনি সরাসরি কথা বলেছিলেন।

তারা তখন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। তাদের কাছে তিনি নিজের ভুলের কথা উল্লেখ করবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং ঈসার কাছে যাও। যিনি

আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, কালিমা ও রাহ। আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।

তখন তারা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর কাছে যাবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা, যার আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

আদম, নৃহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা – আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। তাঁরা কেউ সুপারিশ করতে সাহস করবেন না। প্রত্যেক নবি নিজেদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করবেন।

তারপর সবাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাবে। তিনি তাঁর রবের কাছে অনুমতি চাইবেন এবং তাঁকে অনুমতি দেয়া হবে। তিনি তাঁর রবের সামনে সিজদাহবনত হবেন। আসমান ও জমিনের একচত্র অধিপতি, বিচারদিনের মালিক আল্লাহ আয়া ওয়া জাল যতক্ষণ ইচ্ছ করবেন ততক্ষণ মুহাম্মাদ ﷺ সেই অবস্থায় থাকবেন।

তারপর তাঁকে ﷺ বলা হবে,
‘হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে।
চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা
হবে।

মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসার
দ্বারা তাঁর প্রশংসা করবেন এবং বলবেন,

**‘উম্মাতি, উম্মাতি
(আমার উম্মাহ, আমার উম্মাহ)’**

সমগ্র মানবজাতি, এমনকি নবিগণ আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম নিজ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ঠ থাকবেন। সবাই নাফসি, নাফসি করতে থাকবেন। মুহাম্মাদ ﷺ বলবেন, আমার উম্মাহ, আমার উম্মাহ! [১]

এই সেই মানুষ যার সুন্মাহকে আজ আমরা তুচ্ছ করছি। সেই মানুষ যার অপমান, অবমাননা আমরা নির্বিকারভাবে সয়ে যাচ্ছি। যার অবমাননাকারীদের আমরা নির্বিশ্বে আগ্রাসন চালিয়ে যেতে দিচ্ছি। এটা হলো সেই মানুষটা, যিনি গভীর রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে তোমার আর আমার কথা চিন্তা করে কাঁদতেন। যিনি বারবার আল্লাহর কাছে তাঁর উম্মাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

এটা হলো সেই মানুষটা যিনি আমাদের দেখেননি, কিন্তু আমাদের জন্য বারবার চিন্তিত হয়েছেন, কান্না করেছেন, দুআ করেছেন। এটা হলো সেই মানুষটা, যিনি সুপারিশ করবেন, সেই ভয়ঙ্কর দিনে, তাঁর উম্মাহর জন্য। আল্লাহম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়িনা মুহাম্মাদ।

এই মানুষটার কথা স্মরণ করো। যেই মহান সন্তা তাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর ব্যাপারে সচেতন হও। নিজের পরিবার, আর প্রাণের জন্য ভালোবাসাকে এক পাঞ্জায় তুলে এই মানুষটার জন্য তোমার মনে যে ভালোবাসা আছে সেটাকে অন্য পাঞ্জায় রাখো। দুনিয়ার মাঝা, সম্পদ, গা-বাঁচানো জীবনকে এক পাঞ্জায় তোলো আর রাসূলুল্লাহর সম্মানের প্রশংকে আরেক পাঞ্জায় তোলো।

[১] বুখারি, ৭৫১০; মুসলিম, ১৯

পুরো পৃথিবীকে এক পাঞ্জায় তোলো আর মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ-কে আরেক পাঞ্জায় তোলো। আর বিচার করো, তুমি আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কতটুকু ভালোবাসো। নিজেকে প্রশংক করো, এই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দায়িত্ব তুমি কতটুকু পালন করেছ। চিন্তা করো, যদি হাশরের দিন তাঁর ﷺ সাথে তোমার দেখা হয়, আর এই প্রশংকগুলো তিনি ﷺ তোমাকে করেন, তাহলে কী জবাব দেবে?

অবশ্যই

তোমাদের নিকট তোমাদের
মধ্য হতেই একজন রাসূল
এসেছেন, তোমাদের যে
দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার
জন্য বড়ই বেদনাদায়ক।
তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী,
মুমিনদের প্রতি তিনি দয়ালু

৯১১৮



শেষ ঠিকানা

জাহিদুল ইসলাম তামিম

১. বস্তির পোলাপানগুলো বেজায় বদ হয়ে গিয়েছে। ছোট ছেলেপেলেগুলোকে নিয়েও কীসব করে বেড়ায়। বাসায় আজকে বাবা নেই বলে আহমাদকে তার সাথে নিজের খালাম্বার বাসায় নিয়ে এল রাবেয়া। খালাম্বা বলতে রাবেয়া যার বাসায় কাজ করে সে। তিনিদিন যাবৎ জরে পুড়ে রাবেয়া। দুইদিন কাজে যায়নি তাই। তার খালাম্বা এজন্য বেজায় নাখোশ। আজ যেতেই হবে। কোনো ধরনের বাহানা চলবে না, বলে দিয়েছেন খালাম্বা। ঝা চকচকে ফ্ল্যাট বাড়িটার ড্রয়িং রুমের মেরেতে বসিয়ে রাখা হয়েছে আহমাদকে।

আহমাদ বুবাতে পারছে না, কী করবে বসে বসে। মাকে কত করে বলল সে আসতে চায় না। আবেদন তো গৃহীত হয়নি, তার ওপর মাথায় কতগুলো চাটি পড়েছে। ড্রয়িং রুমের একটা টেবিলের ওপর কতগুলো খেলনা দেখতে পেল সে। সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। একটা ঘোড়া দেখতে পেল, সেটার ওপর একটা মানুষ বসা। এগিয়ে গিয়ে উঠিয়ে নিল খেলনাটা। কিছুক্ষণ এটার সাথেই সময় ক্ষেপণ করার সীদান্ত নিল সে। ঠিক তখনই খালাম্বা এসে হাজির। এসেই ধরক দিয়ে উঠলেন তিনি,

‘হাতে কী ওইটা তোর? মগের মুঞ্চুক পেয়েছিস, যা খুশি তাই করবি? চুরি করার ধান্দা, না?’
চিন্কার শেষ করে আহমাদের হাত থেকে খেলনাটা কেড়ে নিলেন তিনি। ততক্ষণে রাবেয়াও ভেতরের ঘর থেকে চলে এসেছে। জরের প্রকোপে মাথাটা ভন্ডন করছে তার।

‘ছোটলোকের বাচ্চা সব তোরা। মিথ্যা বাহানা করে কাজে আসে না একজন আর তারই ছেলে এদিকে চুরি করছে।’

রাবেয়া তার খালাম্বার চারিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তার সাথে সবসময়ই বাজে আচরণ করেন তিনি। নিজের ছেলেকেও রঞ্জে রঞ্জে চেনে সে। আর যাই হোক চুরির শিক্ষা সে ছেলেকে কখনো দেয়নি। খালাম্বাকে কিছু বলেও লাভ হবে না। এখানে তার দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া কিছু করার নেই।

ততক্ষণে আহমাদের গালে দু চারটা চড়-থাপ্পড় পড়ে গিয়েছে। চকচকে মেরোর দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে। নিজেকে একটা অপদার্থ মনে হচ্ছে তার। হোক না এগারো বছরের শিশু, আস্তসম্মান তো আছে, না কি? গাল বেয়ে দু ফোটা নোনা পানি গড়িয়ে পড়ে নিচে। ঘকঘকে মেরোর ওপর অশ্রবিন্দুগুলোকে শিশিরের মতো দেখায়।

‘খালাম্বা, মাফ কইরা দেন, ছোড় পোলা বুবো নাই।’ তামাশা না দেখতে পেরে কাকুতি বেরিয়ে এল রাবেয়ের মুখ থেকে।

‘নিজের অবস্থান বুবিস না? তোরা ছোটলোক, ছোটলোকের মতো থাকবি। জানি তো তোদের স্বভাব ভালো না। চুরি করার জন্য তক্কে থাকস। এই ছেলেকে আর কোনোদিন আনবি না, বুচ্ছস?’ ক্রোধান্তিম খালাম্বা বলে উঠলেন।
‘জে, খালাম্বা বুচ্ছি।’

কথা শেষ করেই মুখ ঝামটা দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন বাড়ির কর্তৃ। হাটার মাঝে অস্বস্তিকর দাস্তিকতা।

২.

রাবেয়া ভেবেছিল কাজ শেষে বের হয়ে ছেলেকে আচ্ছা ঝাড়ি দেবে। কিন্তু শরীরে তেমন শক্তি নেই। জরটা কাবু করে ফেলেছে তাকে। এরকম দুর্বল কখনোই অনুভব হয়নি। হাটতেও হচ্ছে অনেক কষ্ট করে।

মায়ের ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে আতকে
উঠে আহমাদ। ছোট হলেও বুঝতে পারে যে
মায়ের শরীর ঠিক নেই।

৩.

খালেদ ঘরের দরজার বাইরে বসে আছে মাথায়
হাত দিয়ে। স্ত্রী তার আজ দুপুরেই পরপরে
পাড়ি জরিয়েছে। সে ভেবেছিল, সামান্য জ্বর-ই
তো। এমনিই সেরে যাবে। তিনিদিন বিছানায়
দিনাতিপাত করার পর দুপুরের দিকে আহমাদ
বলল, তার মা না কি নড়ছে না। দৌড়ে ডাঙ্গার
ডেকে এনেছিল সে। কিন্তু না, অনেক দেরি হয়ে
গিয়েছে ততক্ষণে। রহ দেশাস্তরি হয়ে গিয়েছে।
ফিরিয়ে আনার সাধ্য কারও নেই। ছোট আহমাদ
তাকিয়ে আছে মায়ের নিখর দেহটার দিকে।
দেখে মনে হয় ঘুমাচ্ছে।

৪.

মাসজিদের পাশের কবরস্থানটাতেই কবর দেয়া
হবে রাবেয়াকে। শেষ বারের মতো মায়ের
মুখখানা দেখে নিল আহমাদ। কাঁদতে কাঁদতে
চোখের পানি শুকিয়ে গেছে তার।

কবর ভরাট করছে খালেদ। মায়ের কবরের
কয়েক কদম সামনেই আরেকটা খোঁড়া কবর
দেখতে পেল আহমাদ। কিছুক্ষণ পরই কিছু লোক
একটা লাশ নিয়ে এল। দলটার সাথে একটা
বাচ্চাও দেখতে পেল সে। হ্যাঁ চিনতে পেরেছে।
তার মা যার বাসায় কাজ করে তার ছেলেই
তো এটা। ছোট বাচ্চা। বুরো উঠতে পারছে না
ঘটনাপ্রবাহ। পেছনদিকের লোকগুলো কী যেন
বলাবলি করছে। একজনের গলার আওয়াজ
কানে এল আহমাদের।

সাথে একটা বাচ্চাও দেখতে পেল সে। হ্যাঁ
চিনতে পেরেছে। তার মা যার বাসায় কাজ করে

তার ছেলেই তো এটা। ছোট বাচ্চা। বুরো উঠতে
পারছে না ঘটনাপ্রবাহ। পেছনদিকের লোকগুলো
কী যেন বলাবলি করছে। একজনের গলার
আওয়াজ কানে এল আহমাদের।

‘আহারে, মহিলাটার বয়স অনেক কম ছিল।
গাড়ি এঙ্গিডেন্ট করে আজকে সকালেই চলে
গেল। তার স্বামীটা বেঁচে গিয়েছে। হাত আঘাত
পাওয়া বাদে তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। ছোট
বাচ্চাটার কী হবে এখন?’

আহমাদ বুঝতে পারল, ওই খাটিয়ার সাদা
কাফনের ভেতরে তার মায়ের খালান্মাই ওটা।
পড়স্ত বিকেলে লালচে আকাশের নিচে কিছুক্ষণ
আগেও জীবিত থাকা দুটো দেহকে প্রাস
করছে কবরের মাটি। দুজন দূরকম পৃথিবীর
বাসিন্দা। খালান্মার ভাষায় একজন ছেটলোক,
আরেকজন আলিশান ফ্ল্যাটের কর্তী। কিন্তু
অস্তিম ঠিকানা দুজনের একই। পোকামাকড় আর
কীটের বসবাস মেই মাটির তলদেশে সেখানে।
এক অনন্য ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকল আহমাদ।

কাহিনি শেষ করে দূরে কলাগাছটার দিকে
তাকিয়ে আছেন জমিরউদ্দিন। মুনির আর মাসুদ
যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। কিছু সময় পর
মাসুদ বলল, ‘সত্যি কইরা কন তো ভজুর, ওই
আহমাদ পোলাটা কি আপনে?’

মুচকি হাসেন জমিরউদ্দিন আহমাদ। যেন
হাসিতেই উত্তর পেয়ে যায় মাসুদ। এক
দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জমিরউদ্দিনের দিকে।
জমিরউদ্দিন মাসুদের চোখের দিকে তাকালে
গভীরতা খুজে পেতেন। কিন্তু লাতিফের দৃষ্টির
মতো খেই হারিয়ে যায় না সেই গভীরতায়। বরং
তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। যেখানে আশা আর
বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়, সেখানে খেই
হারাবে কেন কেউ।

একটা লাশ

সাবিত হাসান

আরেকটা দিন শেষ হয়ে এসেছে প্রায়
এখনো কেউ আসেনি,
আসেনি তার ভাই-বোন
এমনকি তার স্ত্রী আর আদরের সন্তানরাও
আসেনি,
যাদের জন্যে জীবনের অর্ধেকটা ছেঁড়া
জুতোতে তালি দিতে দিতেই কাটিয়ে
দিয়েছিল মানুষটা
নিশাস্টা থেমে যাবার সাথে সাথেই সেই
মানুষগুলোই আজ নেই!

হাসপাতালের করিডোরে অনেকটা
বেঙ্গারিশের মতোই পড়ে ছিল তার লাশ,
শেষমেশ চারটা পরিচিত কাঁধও তার
কপালে জোটেনি।
অঙ্গুত কাপড় পরা অচেনা কিছু লোক
তড়িয়ড়ি করে কবর খুঁড়ে অনেকটা পুঁতেই
ফেলল তাকে,
কে জানে শেষ গোসলটা সে পেয়েছিল কি
না?

কাঁচা মাটির কবরের ওপরে বামবাম করে
বৃষ্টি নেমেছে আজ,
এই তো কিছুক্ষণ আগেই কবর দেয়া
হয়েছে তাকে,

কাঁচা বাশের গন্ধটা পর্যন্ত কেটে উঠেনি।
এই মাত্র একটা বাজ পড়ল
আচ্ছা ছেট বেলায় বাজের শব্দ পেলেই
'বাবা!' বলে চিংকার করে জাপটে ধরা
সন্তানগুলোর মন কি একবারও জানতে
চায়নি
আচমকা বাজের শব্দে কবরের ভেতর
বাবার ভয় লাগছে কি না?
শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, 'তোমাকে কক্ষনো
একা ছেড়ে যাব না' বলা মেয়েটার কি
একটিবারও জানতে ইচ্ছে হয়নি
এই কালৰেশাখের রাতে কবরের ভেতর
তার সব থেকে প্রিয় মানুষটার একা
লাগছে কি না?

আচ্ছা এমন কি হতে পারে না মানুষটা
এখনো জীবিত আছে মাটির নিচে?
হয়তো সে অভিনয় করছে,
হয়তো সে দেখতে চাচ্ছে কে কে সত্যই
তাকে ভালোবাসে,
কবরের ভেতর থাকা মানুষটা হঠাৎ করে
জেগে উঠলে এত সব তেতো বাস্তবতার
হাতে হয়তোবা দ্বিতীয়বার খুন হবে সে।



ବିନ୍ଦୁ ଥିକେ ପିନ୍ଧୁ

ଲେଖକঃ ଏନାମୁଲ ହୋସାଇନ୍ ।



রাত ১০ টা পার হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। স্টেশনে বসে আছি। স্টেশন মাসজিদের সামনের এক বেঞ্চিতে। হাতে আধখোলা একটা বই। পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মন বসছে না স্টেশনের হটেলগোলো। ঈশ্বার জায়নামাত হয়ে গিয়েছে আগেই। স্টেশন মাসজিদের ছোটো গেটে তালাও ঝুলে গেছে। হটাং এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে ঢোক পড়ল। হস্তদন্ত হয়ে তিনি আমার দিকেই ছুটে আসছেন। কিছুটা অবাক হলাম। উনাকে তো চেনা মনে হচ্ছে না। ভদ্রলোক কাছে এসে আমাকে উদ্বিঘ গলায় প্রশ্ন করলেন ‘ভাই, আপনার কাছে কি কোনো জায়নামায় হবে?’

প্রথম ভদ্রলোক জায়নামায় বানিয়ে সালাত পড়েছিলেন। তার সালাত কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে। তিনি সাওয়াব পেতে পারেন নাও পেতে পারেন। কিন্তু তার বানানো জায়নামায়ে যত মানুষ সালাত পড়বে সেখান থেকে তিনি সাওয়াব পাবেন

ভদ্রলোক ঈশ্বার সালাত পড়বেন। কিন্তু জায়গা পাচ্ছেন না। মাসজিদ তো বন্ধ।

জায়নামায় নিয়ে ঘুরার স্বত্ত্বাব আমার নেই। ভদ্রলোককে হতাশ করতে হলো। পাশেই কিছু তাবলীগের মুরব্বি ছিলেন। তাঁদের কাছে যেতে বললাম উনাকে। সেখানেও হতাশ হতে হলো। শেষমেশ, পাশের দোকান থেকে পুরোনো একটা কাগজের বাক্স নিয়ে সেটা ভাজ করে তার ওপরই সালাত আদায় শুরু করলেন। ট্রেন আসার অনেক দেরি ছিল। হাতে অফুরন্ত সময়।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছিলাম আমি।

ভদ্রলোকের সালাত পড়া শেষ হলে উনি চলে গেলেন। আমিও কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তারপর হটাং খেয়াল করলাম সেখানে মানে সেই কাগজের বাক্সের জায়নামায়ের ওপরে আরেকজন সালাত পড়ছেন।

মাথায় হটাং করেই একটা চিন্তা আসল তখন।

প্রথম ভদ্রলোক জায়নামায় বানিয়ে সালাত পড়েছিলেন। তার সালাত কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে। তিনি সাওয়াব পেতে পারেন নাও পেতে পারেন। কিন্তু তার বানানো জায়নামায়ে যত মানুষ

সালাত পড়বে সেখান থেকে তিনি সাওয়াব পাবেন। (সালাত আদায়করীদের সাওয়াব করানো হবে না।) যদি এখানে ১০০ জন মানুষ সালাত পড়েন, তাহলে ১০০ জন মানুষের সালাতের সাওয়াব তিনি পাবেন।

ভালো কাজের সূচনা করা খুবই সাওয়াবের কাজ। তুমি সেই কাজটি শুরু করার সময় হয়তো তাবতেও পারবে না, এই কাজটি একসময় কী বিশাল এক কর্মজ্ঞে পরিণত হতে পারে।

ভালো কাজ যত ছোটই হোক অবহেলা কোরো না।

মুসআব ইবনু উমাইর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা চিন্তা করো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে মদিনায় ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসেন উনি। উনার মাধ্যমে আউস এবং খায়রায় গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। উনার হাতে ইসলাম কবুল করেন সাদ বিন মুয়ায় রদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো মানুষ, যার মতৃতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় মুসআব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর দাওয়াতের প্রভাবে মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত করার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। মদিনায় ইসলামের ঘাঁটি তৈরি হয়। এখান থেকেই ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্ব।

এবার একটু চিন্তা করো তো, মুসআব রদিয়াল্লাহু আনহু কী বিপুল পরিমাণ সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি যখন দাওয়াত নিয়ে মদিনায় এসেছিলেন, খেজুর বাগানে বসে বসে আউস বা খায়রায় গোত্রের নেতাদের ইসলামের কথা শোনাচ্ছিলেন, তখন কি ভেবেছিলেন তাঁর এই ছোট ছোট কথাগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ এক বিপ্লবের সূচনা করছেন?

মানুষের উপকার করা, সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলা, দারোয়ানকে-রিকশাওয়ালাকে সালাম দেওয়া,

আবৃ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় পথে থাকা কাটাযুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে ফেলল। (এ কাজ আল্লাহর এতই পছন্দনীয় হলো যে) আল্লাহ তালাল তার এ কাজ সাদরে কবুল করে নেন। তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।’[১] ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, সেই ব্যক্তিকে এই আমলের ওসীলায় জানাতে প্রবেশ করানো হয়েছে।[২]

তোমাদের আমার নিজের একটা ঘটনা বলি। আমি এক সময় বিভিন্ন কারণে হতাশায় ভুগছিলাম। একের পর এক সমস্যা আসছিল। একটা সমাধান হলে অন্যটা আরও জটিল হয়ে উঠত। কী করব বুবে উঠতে পারতাম না। মন খারাপ করে বসে ছিলাম। আমার রুমেট বলল- চল, ফুটবল খেলে আস।

ফুটবল ভালো লাগত না। তারপরেও গেলাম। এক দেড় ঘন্টা ফুটবল খেলে ঝাস্ত হয়ে যখন রুমে ফিরছিলাম, তখন রুমেট আমার ঘাড়ে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল- এনাম, চিন্তা করিস না; আল্লাহই আছেন। আর তুই মেধাবী। বলতে গেলে আমাদের সবার চাইতো একটা না একটা সমাধান বের হয়ে যাবে। (এই কথাগুলো লেখব কি না তা ভেবে অস্বস্তি লাগছিল। শেষেরে লেখেই ফেললাম। নিজেকে বড় প্রমাণ করার ইচ্ছা থেকে নয়। কেবল তোমাদের বাস্তব অবস্থাটা বোঝানোর জন্য।)

ওর কথাগুলো ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল। আল্লাহই সমস্যা সমাধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যে ভেঙ্গে পড়েছিলাম, কোনো কিছু করার আগ্রহ, উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছিলাম তার অনেকটাই ফিরে এসেছিল তার ছোট ছোট এই কয়েকটা বাকেয়। সে জানতেও পারল না তার এই ছোট ছোট কয়েকটা কথা আমার জীবনে কতটা প্রভাব ফেলল।

চারিদিকে অন্যায়, যুদ্ধ অসত্য আর অধর্মের ছড়াচড়ি। আমরা আশা হারিয়ে ফেলি। প্রতিবাদ করতে ভয় পাই। ভাবি, আমার এই মন্দু প্রতিবাদে কী-ই বা হবে। অথবা আমেলা বাড়ানোর দরকার নেই। অথবা আমরা কিন্তু জানি না, আমার এই

সামান্য প্রতিবাদেই অনেক কিছু বদলে যেতে পারে।

কোনো ভালো কাজকে ছোট ভাববে না। [৩] যতই ছোট হোক করবে। তুমি জানো না এর শেষ কতটা মধুর হতে পারে!

তথ্যসূত্রঃ

[১] বুখারি, ৬৫২: মুসলিম, ১৯১৪।

[২] মুসলাহু আহমাদ, ১০৪৩২।

[৩] মুসলিম, ২৬২৬।

কুয়াশার চাদরে

সিদ্ধিকুর রহমান



গলা থেকে পা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে হয়তো
লেখাটি পড়ছ। কারণ, আজকের সকালটাও যে
গায়ে ছাইরঙা কুয়াশার চাদর জড়িয়ে রেখেছে!
অথবা একরাশ শুভ ধোঁয়ায় নাক ডুবিয়ে চুমুক
দিছ চায়ের কাপে। চা খেতে খেতেই তোমার
সাথে কিছু আড্ডা দিই চলো..

ব্যবহার করবে? কোনটা সবচেয়ে ভালো?
এসব কনফিউশনের কারণ নেই। আমাদের
দেশীয় প্রোডাক্টগুলোই অনেক ভালো মানের।
যেকোনো একটি ব্র্যান্ড ইউজ করতে পারো।
তবে কোনো নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ব্যবহার
করার পর যদি সমস্যার সম্মুখীন হও বা পণ্যটি

আতঙ্কের নাম হলো- গোসল। এ যেন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

আচ্ছা, শীতের এই সময়টা তোমার কাছে কেমন
লাগে বলো তো? খুব রুক্ষ-শুক্ষ-বিদ্যুটে?
হ্যাঁ, কিছুটা তো তা-ই। আর সে জন্যই এই
সময়টাতে কিন্তু আমাদের আরও একটু বাড়তি
সর্তক থাকা উচিত।

তাহলে চলো, বাটপট শুনে নিই শীতের এই
সময়টাতে কী করব, আর কী একেবারেই করব
না-

এই সময়টাতে অনেকের কাছেই একটি
আতঙ্কের নাম হলো- গোসল। এ যেন যুদ্ধ যুদ্ধ
খেলা!

তবে তোমারা যারা সচেতন তারা তো জানোই,
গোসল না করাটা মোটেই ভালো কিছু নয়। এতে
করে বরং শরীরে রোগজীবাণু বাসা বাঁধার
উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়।

তাই গোসল একেবারেই বাদ না দিয়ে কুসুম
গরম পানিতে গোসল করে নিতে পারো। এতে
করে শরীরের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় থাকবে
আর সারাটা দিন তুমি থাকবে ফ্রেশ ফুরফুরে
মেজাজে, ইনশাআল্লাহ!

একইভাবে ওয়ুর ক্ষেত্রেও কুসুম গরম পানি
ব্যবহার করতে পারো।

গোসল বা ওয়ুর পরে শরীরে ময়েশ্চারাইজিং
লোশন বা ক্রিম মেখে নেওয়া উচিত। এতে
শরীরের ত্বক শুক্ষ হয়ে যায় না। অনেকে
কনফিউশনে থাকে, কোন ব্র্যান্ড

তোমার ত্বকের উপযুক্ত না হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত
পণ্যটি আর ব্যবহার না করে অন্য ব্র্যান্ড ব্যবহার
করাই ভালো।

অনেকের ধারণা, সানক্রিন লোশন কেবলমাত্র
গরমের দিনের জন্য। তবে শীতের দিনেও কিন্তু
রোদের তীব্রতা কম থাকে না। তাই রোদে
বেরোবার সময় সম্ভব হলে সানক্রিন লোশন
মেখে নিতে পারো।

ঠাঁটের প্রতি বাড়তি যত্ন নাও। ঠাঁটের ওপরের
ত্বক পাতলা হওয়ায় এর ওপর শীতের প্রভাব
পড়ে সবচেয়ে বেশি।

অনেকের একটা অঙ্গুত অভ্যাস থাকে। একটু
পরপর জিভ দিয়ে শুকনো ঠাঁটুকু ভিজিয়ে নেয়।
। এতে বরং ঠাঁট ফাটার সন্তাবনা আরও বেড়ে
যায়।

কাজেই জিভের ব্যবহার না করে ‘পেট্রোলিয়াম
জেলি’ ব্যবহার করো।

ওহ, ভালো কথা। শুধু শরীরের বাইরের অংশের
নজর দিলেই কি কাজ শেষ?

না! সুস্থ থাকতে হলে রোজকার খাবারের
মেনুতেও কিন্তু একটু নজর দিতে হবে।

মজার ব্যাপার হলো, আল্লাহ তাআলা শীতকালে
প্রচুর ফলমূল-শাকসবজির নিয়ামাত দিয়ে
আমাদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার
সুযোগ করে দিয়েছেন, আলহামদুল্লিল্লাহ!

তাই মৌসুমি ফলমূল ও শাকসবজি পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। তোমরা কি জানো যে, মৌসুমি ফলমূলগুলো এ বিশেষ মৌসুমে যে রোগ বালাই হয় তার বিপরীতে অনেক বেশি কার্যকরী?

শীতকালে আমরা অনেক সময় পানি পানের কথা একেবারেই ভুলে যাই। যেহেতু এ সময় ঘাম কম হয়, সেহেতু গরমকালের তুলনায় ‘সামান্য’ পানি কম পান করলে অসুবিধে নেই। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, পরিমাণটা একেবারেই যেন কম না হয়ে যায়।

কারণ তো জানোই, সুস্থ শরীরের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি কতটা দরকারি।

শরীরের যত্ন নেয়ার পাশাপাশি ঈমানের যত্নটুকুও নিয়ো

আরেকটা বিষয়, আপুরা টুকটাক ত্বকের যত্ন নিলেও ভাইগুলো কেন যেন এ ব্যাপারে একটু ড্যামকেয়ার হয়। এমনটা হওয়া যাবে না, বুঝলে?

না, আমি বলছি না টেলিভিশনের চটকদার বিজ্ঞাপনে দেখানো জেন্টস ক্রীম-ফেস ওয়াশ এসব ব্যবহার করতে। ওসব আসলে খুব বেশি কাজের জিনিস না। কিন্তু শীতের এই সময়ে ত্বকের একটু বাড়তি যত্ন তো নিতেই হবে।

এক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার বলে নিই। যে ভাইয়াদের দাঢ়ি রয়েছে তারা কিন্তু কিছুটা হলেও অ্যাডভাটেজ পাবে! কারণ দাঢ়ি পুরুমের মুখের সংবেদনশীল ত্বকের জন্য একটা বাড়তি প্রোটেকশন হিসেবে কাজ করে।[১]

দেখলো তো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ কতটা বৈজ্ঞানিক!

এইরে.. তোমার চা তো একদম জুড়িয়ে গেল!

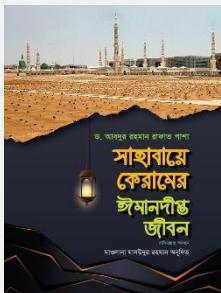
আজকের মতো আমি যাই। আল্লাহ চাইলে আবার কোনো একদিন আড়তা হবে। ততদিন শরীরের যত্ন নেয়ার পাশাপাশি ঈমানের যত্নটুকুও নিয়ো। আল্লাহ হাফিয়।

[১] Are beards unhygienic? - <https://tinyurl.com/tnzxtz9m>

বই পরিচয়

পড়তে পারো নিচের বইগুলো

- লস্ট মডেস্ট



সাহাৰায়ে কেৱামেৰ ঈমানদীপু জীৱনী

লেখকঃ ড. আবদুর রহমান রাফিকত পাশা
ৱাহন্মা প্ৰকাশনী

একজন শাইখ বলেছিলেন, ‘আপনি দুনিয়াৰ
সেলিব্ৰেটিদেৱ সম্পর্কে যত বেশি জানবেন,
তাদেৱ তত বেশি ঘৃণা কৰবেন। আৱ আসমানেৱ
সেলিব্ৰেটিদেৱ সম্পর্কে যত বেশি জানবেন,
তাঁদেৱকে তত বেশি ভালোবাসবেন।’

দুনিয়ায় আমাদেৱ রোল মডেল কাৰা? আমৱা
কাদেৱ পছন্দ কৰি? কাদেৱ মতো হতে চাই?
ফুটবলাৰ, ক্ৰিকেটাৰ, নায়ক, গায়ক এদেৱ
মতো, না? এদেৱ মতোই আমৱা হতে চাই।
অথচ এদেৱ ব্যক্তিগত জীৱন কেমন? মাদক,
পৱকীয়া, উশংখলা, অবাধ যৌনাচাৰ, হতশা।
এদেৱ অনেকেই কয়দিন পৱপৱ আইন ভেঙে
জেলে যায়। অনেকেই আভাস্ত্যা কৰে।

তুমি যখন এই দুনিয়াৰ সেলিব্ৰেটিদেৱ রোল
মডেল বানাবে, তাদেৱ নিয়েই তুমি পড়ে থাকবে,
তাদেৱ পাগল ফ্যান হবে, তখন খুব সহজেই
তাদেৱ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হবে তুমি। না চাইলেও
তোমাৰ মাঝে অনেক নেতৃত্বাচক বিষয় চলে
আসবে। তাই তোমাকে চিনতে হবে আসমানেৱ

সেলিব্ৰেটিদেৱ।

কেন চিনতে হবে?

কাৰণ, তাৰা ছিলেন এমন মানুষ, যাদেৱ
আঞ্চলিক ভালোবাসেন। যাদেৱ ওপৱ আঞ্চলিক
সন্তুষ্ট।

তুমি কি চাও না, আঞ্চলিক তোমাকে
ভালোবাসেন? তুমি কি চাও না, আঞ্চলিক
তোমাৰ ওপৱ সন্তুষ্ট হয়ে যান? বলো তো,
আঞ্চলিক যদি তোমাৰ ওপৱ রাজি-খুশি হয়ে
যান, তাহলে এৱচেয়ে বড় পাওয়া, বড়
সফলতা আৱ কী আছে?

সফলতাৰ এই পথেৱ সন্ধান পেতে, সেই
পথে চলতে তোমাকে জানতে হবে সেসব
পথিকদেৱ জীৱনী, যাবা হেঁটে গেছেন
আঞ্চলিক পথে। এবং হয়েছেন সফল।
জীৱনেৱ দুঃখ, কষ্ট, জটিলতা, অস্থিৱতা,
না-পাওয়াৰ বেদনা যখন তোমাৰ চোখে জল
নামায়, তখন দৱকাৱ পড়ে কিছু সান্ত্বনাৰ,
অনুপ্ৰেৱণাৰ। আসমানেৱ সেলিব্ৰেটিদেৱ
জীৱনী তোমাকে এই সান্ত্বনা আৱ অনুপ্ৰেৱণা
দেবে নিশ্চিত, ইনশাআঞ্চলিক।



আয়নায়ক

লেখক: ড. ইয়াদ আল কুনাইয়ী
ইলমহাউস পাৰিলিকেশন

বালিকা থেকে তরুণীর খাতায় নাম লেখানো মেয়েটা ঘট্টোর পর ঘট্টো চেয়ে থাকে আয়নার দিকে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিজেকে। মুঞ্চ বিস্ময়ে ভাবে - একটা ডানা থাকলে ভালো হতো, আমাকে পরী বলে ডাকতে আর কেউ দ্বিধাদন্তে ভুগত না।

ঘর থেকে বের হবার আগেও তো আয়নায় সময় কাটিয়েছে নবীন কিশোর। পাড়ার মোড়ের সেলুনের আয়নাতেও আরেকবার চেক করে নেয় জেল মিশ্রিত চুলের স্পাইকটা ঠিক আছে কি না। আজকে প্রথম ডেটিং!

নববিবাহিতা যুবতি মেহেদি রাঙ্গা হাতে আয়নার সামনে বসে কাজল দেয় কাজলের চাইতেও কালো চোখে। মৃদু হাস্যে বাঁধে খোপা, নীল শাড়ির কুঢ়ি ঠিক করতে করতে তাবে একান্ত আপন করে পাওয়া মানুষটার কথা।

১৭ বার ইন্টারভিউ ফেরত যুবক, দুপুর রোদে বহুদূর থেকে হেঁটে আসে। মানিব্যাগের জার্নাল ব্যালেন্স মিলিয়ে অর্ডার দেয় দুটো সিংগাড়া। হোটেলের বেসিনে হাত ধৃতেধৃতে চোখ যায় আয়নায়। ভীষণ দুঃখী এক মৃতি তাকিয়ে আছে ওপাশ থেকে। গেল সন্ধ্যায় মানবরের ভঙ্গা আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে সাহস দিতে দিতে বহুক্ষণ কেঁদেছিল সে, আজ হয়তো আবারও...

টাইয়ের নড ঠিক করতে করতে অন্যমনস্ক সরকারি অফিসের ঘুষখোর বড়কর্তা আয়নায় দেখেন অর্ধেক চুল পেকে গেছে তার। ছেলে দুটো ড্রাগ এডিস্ট্রিড, ছেলেদের মাকেও সেদিন দেখেছেন আফজাল সাহেবের সাথে ঘুরে বেড়াতে। আয়নায় চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, গভীর একটা হাতাকার উঠে হাদয়ে, ‘এত অল্পতেই বুড়িয়ে গেলামা!'

আয়না!

জীবনের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ। হয়তো আমরা খেয়াল করি অথবা করি না। কিন্তু ঠিকই আমাদের জীবনের হাসি-কাঙ্গা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সাথে জড়িয়ে থাকে আয়না। আমাদের দুঃখে কেঁদে উঠে, আবার হেসে উঠে আমাদের সুখে। অনেক মানুষের

মা, বন্ধু বা আপন মানুষটার চাইতেও বেশি আপন। কঠের প্রহরগুলোতে বারে যাওয়া প্রত্যেক অঞ্চলের নীরব সাক্ষী। জীবন পথে ক্লান্ত হয়ে আমরা আশ্রয় খুঁজি আয়নায়, খুঁজে খুঁজে বের করি জীবনের ধূলোবালি। তারপর আবার পরিপাটি করে সাজিয়ে নিই নিজেকে, আবার নামি পৃথিবীর পথে।

জান্মাত বা জাহানাম পর্যন্ত বিস্তৃত এই পথে চলতে গিয়ে ধূলো জমে আমাদের হাদয়েও। চিরচেনা আয়নার প্রতিবিস্মে ধরা পড়ে না এই ধূলোবালি। পরতের পর পরত ময়লা জমে। ময়লা জমে জমে হয়ে যায় যা। ব্যাথায় কাতর হয়ে অস্থির হয়ে যাই আমরা। আরও অস্থির হয়ে যাই অসুখের কারণ খুঁজে না পেয়ে।

ক্রমাগত আয়না পরিবর্তন করি আমরা। একটা পর একটা করে হাতে তুলে নিই নানা ‘তন্ত্র-মন্ত্রে’ আয়না। লোকে কী বলবে, সামাজিকতা, সংস্কৃতি, ভোগবাদ, পুঁজিবাদ আর কুফরের ধূলো জমা থাকে সেই আয়নাগুলোর কাঁচে। হাদয়ের ধূলো দেখা যায় না ভুল আয়নায়। ধরা পড়ে না অসুখ, আনন্দ নির্ভর হাতুড়ে চিকিৎসায় আরও বাড়ে যন্ত্রণা। ময়লার পরত পূর্ণ হতেই থাকে, হতেই থাকে...

কৃপকথার স্নেহোয়াইটের সেই জাদুর আয়নার চাইতেও শতগুণ বেশি নির্ভুল আয়না ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে। সেই আয়নায় নিজেদের আবিষ্কার করতেন উনারা প্রতিনিয়ত। আয়নাগুলো শুধু প্রতিবিস্ম নয়, বরং দেখাত আরও কিছু বেশি। দেখাত হাদয়ের প্রত্যেকটি খোপে খোপে লুকিয়ে থাকা ময়লার আস্তরণ। অকপট আয়না ঠিক্যাক জানিয়ে দিত - কেন মেঘ জমে হাদয় আকাশে। সেই আয়না দেখে দেখে পরিপাটি করে সাজিয়েছিলেন নিজেদের এবং এই পৃথিবীকে। সেজেছিল মেঘ, রোদ, জ্যোৎস্না। সেজেছিল মরু, নদী, সাগর। নিপীড়িত নির্যাতিত মানবতা মুক্তি পেয়েছিল মানুষের গোলামি করা থেকে। নতুন করে ইতিহাস লিখতে বাধ্য হয়েছিল নাক উঁচু গ্রিত্তিহাসিকরা।

হারিয়ে যাওয়া তেমনি কিছু আয়না নিয়েই এই ঘর, আয়নাঘর।



জুমুআবার দ্য গ্রেইট ডে

তোয়াহা আকবর

অনেক অসাধারণ, খুব সুন্দর আর পুরক্ষারে ভরা আনন্দের একটা হাদিস দিই? আমাল করবে তো?

বিশ্বাস করো, হাদিসটা পড়ে জাস্ট মাথা নষ্ট হয়ে যাবে তোমার। ইচ্ছা করবে মা-বাবা-ভাই-বোন, ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সববাইকে জানিয়ে দিই। হাদিসটা পড়ার পরে যদি হৃদয়ে একটুও অনুভব করতে পারো, তাহলে আঙ্গুহার দয়া, স্নেহ, মমতা অনুভব করে আরও বেশি ভালোবেসে ফেলবে উনাকে। ইচ্ছা হবে, কীভাবে উনাকে আরও বেশি খুশি করা যায়, আরও বেশি বেশি ইবাদাত করে নিজেকে পবিত্র করা যায়, কত বেশি আখিরাতের মুদ্রা জমানো যায়, আখিরাতে ধনী হওয়া যায়।

চলো, গুণেগুণে প্রতিটা স্টেপ ফলো করে আমালগুলো করবই করব, এই দৃঢ় নিয়ত নিয়ে ‘বিসামিল্লাহ’ বলে হাদিসটা মন দিয়ে পড়ি।

আউস ইবনু আউস সাকাফি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি:

‘জুমুআর দিন যে গোসল করল, অতঃপর আগেভাগে মাসজিদে গেল; হেঁটে চলল, বাহনে চড়ল না; ইমামের নিকটবর্তী হলো; অনর্থক কর্মে লিপ্ত না হয়ে মনোযোগসহ শ্রবণ করল; তার প্রত্যেক কদমে লেখা হবে এক বছরের আমল। তথা এক বছরের সিয়াম ও কিয়ামের (সারারাত তাহজুদ) সাওয়াব।’^[১]

অসাধারণ না?

স্টেপগুলো যেন মনে রাখো, লিখে নাও কিংবা নোট করতে পারো, আলাদাভাবে মনোযোগ দিয়ে হৃদয়ে গেঁথে নিতে পারো, সেজন্য আলাদা আলাদা লাইনে ভেঙ্গে লিখছি।

১. জুমুআর দিন গোসল করা।
২. আগে আগে ও পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাওয়া
৩. ইমামের নিকটবর্তী বসা
শেষের কাতারে পিছিয়ে না পড়া অর্থাৎ
 - ইমামের ঘত নিকটে বসা যায়।

[১] সুনানু আবী দাউদ, ৩৪৫; তিরিমিয়, ৫০২; নাসামি, ১৬৯৭; সহীহ ইবনু হিবান, ২৭৮১; মুসনাদু আহমাদ, ১৬১৭৩

৪. মনযোগসহ খুতবা শ্রবণ করা এবং
বেহুদা ও অনর্থক কর্মকাণ্ড ত্যাগ করার মধ্যে
এসব আদব সীমাবদ্ধ, যা খুব সহজ ও খুবই সামান্য।

জেনে রাখা উচিত যে, খুতবার সময় অহেতুক নড়াচড়া করা অনর্থক
কর্মের অন্তর্ভুক্ত। কিংবা পরে এসে মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনের দিকে
যাওয়াও অনর্থক কর্মের অন্তর্ভুক্ত।^[২]

খুতবায় এত বেশি মনযোগী হতে হবে যে, কেউ কথা বললেও ইশারায়
চুপ করাতে হবে, মুখে কোনো কথা বলা যাবে না। যে বলল, ‘চুপ
থাকো’, সে অনর্থক কর্ম করল; অর্থাৎ যে তার পাশের সাথি অথবা
নিজের সন্তানকে বলল, ‘চুপ থাকো’, সে বেহুদা কাজ করল। খুতবার
সময় যে তাসবীহ অথবা মোবাইল অথবা কোনো জিনিস দ্বারা খেলল,
সেও অনর্থক কর্ম করল।

একই সাথে মনে রাখি, মাসজিদে ঢোকার পর দুই রাকাআত তাহিয়াতুল
মাসজিদের সালাত আদায় করে বসলে তা অতি উত্তম একটি কাজ হবে।

সূতরাং, জুমআর আদবসমূহে শিথিলতা করা একদমই ঠিক নয়।
অন্যথায় আমরা এমন সব বিরাট সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হব, পরকালে যা
আমাদের নেকরির পাঞ্জা ভারী করবে ও অনেক অনেক বছরের সাওয়াব
প্রদান করবে। যদি কোনো ব্যক্তি এই শর্তগুলো পূরণ করে, তবে তার
জন্য এক বছর একটানা সারাবাত তাহাজ্জুদ সালাতের সাওয়াব এবং
এক বছর একটানা সিয়াম পালনের সাওয়াব দেওয়া হবে (সুবহানাল্লাহ)
এবং কদম যত বাড়তে থাকবে সাওয়াবও এই একই অনুপাতে বাড়তে
থাকবে।

পড়লে তো! ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো তো, এরকম স্পেশাল দিন
বছরে কয়টা পাবে! তাহলে, প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাক। আর এখন থেকে
জুমআবার আসলে তোমার-আমার খুশি আর ঠেকায় কে?

এই জুমআ থেকে তুমি-আমি একদম সবার আগে মাসজিদে গিয়ে প্রথম
কাতার টার্গেট করব, ইনশাআল্লাহ। সাথে আরও আলোকিত হওয়ার
জন্য সূরা কাহফের আমল (অন্তত ১০ আয়াত হলেও) আর বেশি বেশি
দরুণ তো আছেই।

[২] সুন্নু আবী দাউদ, ১১১৮; নাসাই, ১৭১৮; মুসনাদু আহমাদ, ১৭৬৯৭; সহীহ ইবনু
ছিব্বান, ২৭৯০।

ডাক্তারখানা

ব্রণ বনাম বয়ঃমন্ত্র

লস্ট মডেস্ট



আয়নার সামনে দাঁড়াতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল অ্যানের। ‘ধূর! আয়নাই দেখব না আর..’ কিন্তু আয়না না দেখলেই যদি সমস্যা সমাধান হতো তবে তো ভালোই হতো। তা তো আর হচ্ছে না। স্কুলের মিজান, বিল্ট, মারফ.. ওদের কে থামাবে? অ্যানকে সামনে পেলেই তো টিকারি শুরু হয়ে যায়। যেন ও একটা কৌতুকের বস্ত!

জীবনে কখনো ব্রণের সমস্যায় পড়েননি এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আদৌ আছে কি না কে জানে! অ্যান যখন আমাকে জানাল ওর সমস্যাটা, তখন ওকে বলেছিলাম একদিন সময় করে ওর সব কথার উত্তর দেব। আজ ওকে নিয়ে বসেছি। তোমার চলে যাবে কেন? তোমরাও বসো, গোল হয়ে বসো কিন্তু সবাই। চলো, বয়ঃসন্ধিকালের এই স্বভাবিক কিন্তু একই সাথে বিরক্তিকর ব্যপারটাকে একটু জানার চেষ্টা করি।

আচ্ছা ভাইয়া, এটা কেন হয়?

-বয়ঃসন্ধিকাল হলো জীবনের একটা স্পেশাল সময়। শৈশব থেকে ঘোবনে পদার্পণের এই রিহার্সেল মোমেন্টটাতে তোমার শরীর নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করে। নতুন করে নানা রকম হরমোনাল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তোমার এই দেহজমিনে।

‘আন্ড্রোজেন’ ঠিক এমনই একটা হরমোন, যা এই সময়ে খুব বেশি বেশি ক্ষরণ হতে থাকে। এবং এই হরমোন বাবাজির কারণেই মুখ, ঘাড়, বুক বা পিঠের হাতে থাকা তেলগ্রাণ্ডিলো ফুলে-ফেঁপে বড় হয়ে উঠতে থাকে আর সেগুলো আরও বেশি বেশি তেল (সেরাম) নিঃসরণ করতে থাকে। ফলাফল- ব্রণ।

একই সাথে বলে রাখি ‘জীবাণু’ সংক্রমণের ফলেও কিন্তু ব্রণ হতে পারে। এবং সেটারও চিকিৎসা রয়েছে। তবে আমাদের আজকের

আড়তার বিষয় কেবল বয়ঃসন্ধিকালীন ব্রণ, ঠিক আছে?

বুঝলাম ভাইয়া। কিন্তু, বয়ঃসন্ধিকালেও তো অনেকের ব্রণ উঠে, অনেকের আবার উঠে না। অনেকের বেশি উঠে, অনেকের কম- এর কারণটা কী?

-ঠিক বলেছ। আসলে সবার হাতের গঠনবৈশিষ্ট্য কিন্তু এক না। আবার হরমোনের তারতম্যের কথা বললাম যে- সেটাও সবার সমান হয় না। সেই সাথে দেখা যায় কেউ টুকটাক হাতের যত্ন নিচ্ছে, কেউবা আবার একেবারেই উদাসীন। পার্থক্যটা আসলে তখনই দেখা যায়।

আচ্ছা! আচ্ছা! তো এবার আসল কথা বলেন ভাইয়া, আমাদের যাদের এই সমস্যা আমরা করব টা কী?

- বলছি, শোনো...

প্রথম কথা হলো, বয়সটাকে বিবেচনা করে বিষয়টাকে সহজভাবে নাও, অহেতুক চিন্তা করবে না। কারণ- দুশ্চিন্তা, স্ট্রেস এগুলো শরীরের হরমোনাল কার্যক্রমকে আরও প্রভাবিত করে, যা পরোক্ষভাবে ব্রণ তৈরির জন্য সহায়ক।

ঘুম পর্যাপ্ত হচ্ছে তো? কোনো কারণে যদি তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে (রাত জেগে পড়াশোনা বা এমনি অকারণে রাত জাগা) তো সেটা সমাধানের চেষ্টা করো। কারণ, নিদ্রাহীনতা এই সমস্যাকে আরও বাড়াবে বই কমাবে না।

প্রচুর পানি পান করো।

রোদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, প্রয়োজনে ক্যাপ বা ছাতা ব্যবহার করবে।

অতিরিক্ত এসিড বা ক্ষারযুক্ত সাবানের বদলে Dove জাতীয় কোমল সাবান ব্যবহার করবে। সাবানের পিএইচ সীমা ৫.৫ এর কাছাকাছি হলে বেশি ভালো হয়।

ভিটামিন-এ/সি/ই যুক্ত খাবার বিশেষ করে রঙিন ফলমূল-শাকসবজি বেশি পরিমাণে খাবে।

জিংক সমৃদ্ধ খাবারও (মাংস, ডিম, বাদাম) ত্বকের জন্য বেশ ভালো।

আক্রান্ত স্থানগুলোতে অ্যালোভেরা জেল/মধু লাগিয়ে ইনশাআল্লাহ উপকার পেতে পারো। অ্যালোভেরায় ময়েশচারাইজিং উপাদান রয়েছে, আর মধুতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। (যেভাবে ব্যবহার করবে: ২ টেবিল চামচ মধুর সাথে ১ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা মিশিয়ে ভরণের স্থানে লাগাও। দশ মিনিট পর কুসুম গরম পানিতে ধূয়ে নাও।)

এছাড়াও বাজারে ভালো ব্র্যান্ডের কিছু অ্যালোভেরা জেল/ক্রিম/ফেসওয়াশও রয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারো।

আরেকটা কাজের জিনিস হলো- নিম পাতা। নিম পাতা বেটে, পুরা মুখে লাগিয়ে রাখো ১০/১৫ মিনিট। সপ্তাহে ১/২ বার।

সবশেয়ে প্রয়োজন মনে করলে তুমি ভালো কোনো চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে পারো।

যা যা করবে না-

খোঁটাখুঁটি একদমই করবে না। এতে করে তুমি কিন্তু নিজেই ত্বকের মধ্যে আরও জীবাণু প্রবেশের রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছ!

বেশি সচেতন হয়ে বারবার মুখ ধোয়ার দরকার নেই। বরং দিনে পাঁচবার ওয়ে করাই যথেষ্ট। অতিরিক্ত মুখ ধোয়া/বেশি বেশি ঘষা-মাজার ফলে ত্বক রুক্ষ-শুক্ষ হয়ে শেষমেশ হিতে বিপরীত হয়।

বাহ! অনেক কিছু জানলাম। আচ্ছা, ডাক্তারের কথা বলছিলেন। ডাক্তার দেখাব কখন?

- বেশিরভাগের ক্ষেত্রে সময়ের সাথে সাথে গ্রণ এমনিতেই ভালো হয়ে গেলেও অনেকের জন্য

ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন হতে পারে।

ওপরের পরামর্শগুলো যথাযথ অনুসরণের পরও অবশ্য ক্রমশ খারাপ হতে থাকলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট যেতে হবে। আরেকটা ব্যপার বলে রাখা দরকার যে, অনেকক্ষেত্রেই ক্ষিনের ট্রিটমেন্ট আসলে একটু সময়সাপেক্ষ এবং একই সাথে ব্যয়সাপেক্ষ তো বটেই। অনেকের তো বছর ধরে ট্রিটমেন্ট চলে। অতএব ধৈর্য ধরে বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

আচ্ছা, ফেসওয়াশের কোনো কার্যকারিতা কি আসলে আছে? কোনটা ব্যবহার করব?

-তা তো কিছুটা আছেই ভাই। তবে ফেসওয়াশটি হতে হবে ভালো ব্র্যান্ডের এবং তোমার ত্বকের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শুক্ষ ত্বকের জন্য:

পেট্রোলিয়াম, মিনারেল অয়েল, ল্যানোলিন যুক্ত ফেসওয়াশ।

তেলাক্ত ত্বকের জন্য:

অ্যালোভেরা, টি ট্রি (Tea tree) অয়েল, স্যালিসাইলিক এসিডযুক্ত ফেসওয়াশ।

যদি কোনোটা ত্বকের জন্য ইরিটেটিং মনে করো, তখন সেটা আর ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

মূলত ব্যবহারের পর তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে- এটা তোমার ত্বকের জন্যে প্রযোজ্য কি না।

ইয়ে মানে, সবই তো ক্লিয়ার হলো, ভাইয়া। তবে, আরও একটা প্রশ্ন ছিল, কীভাবে যে বলি!

আচ্ছা! মাস্টারবেশনের সাথে ভরণের সম্পর্ক কতটুকু? যে যত বেশি মাস্টারবেট করে তার ব্রণ না কি তত বেশি হয়?

-আমি নিজে থেকেই এ ব্যপারটা বলতাম

তোমাদের। ভালো করে শোনো, চিকিৎসাবিজ্ঞান
বলে এ দু'য়ের মধ্যে আসলে সরাসরি কোনো
সম্পর্কই নাই।

মূলত যেই সময়টাতে (বয়ঃসন্ধিকালে)
স্বাভাবিকভাবেই কারণ ঋণ উঠার কথা,
ঐ সময়টাতেই বেশিরভাগের হস্তমেথুনের
বদঅঅ্যোস গড়ে ওঠে বলে দু'য়ে দু'য়ে চার
মিলিয়ে ধরেই নেয়া হয় কারণ বোধহয় এটাই!
না ভাই, হস্তমেথুনের সাথে আসলে এর কোনো
সম্পর্ক নেই আসলো। পুরোটাই মিথ।

কী! খুশি হয়ে গেলো? ভাবছ- আবিবাহ! তবে
তো এবার হস্তমেথুনের বৈধতা চলে আসলো,
না কি?

নাহ! মোটেও না। বরং ঋগের চেয়েও আরও
বড় বড় ক্ষতির কারণ এই পর্ণ-মাস্টারবেশন
দুষ্টজাল। ঋণ তো ছেট পুঁকে, বাকিরা
বিশালদেহী দানব। অতএব জাল ছিন্ন করে

বেরিয়ে এসো। ভেতরটাকে নোংরা রেখে পুরো
ফোকাস্টা কেবল বাইরের আবরণে দিলে চলবে
না কি বলো?

চলো যুদ্ধে নামি। ভেতরটাকে মুছে সাফ করার
যুদ্ধে

হৃদয় গহীনের আবর্জনা দূর হয়ে সেখানে গড়ে
তুলি সুবাসিত ফুলের বাগান।

অঙ্গনিহিত সৌন্দর্যের সীমাহীন দীপ্তি আভা
ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের প্রতিটি চোখে মুখে!

ইনশাআল্লাহ!

‘‘

**আর গুরুন মানুষ কহেটির সম্মুখীন হয় তখন
সে শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে।
তারপর আমি গুরুন তা থেকে ঘৃত্য করে দেই,
সে কহত গুরুন চলে গ্রাম তখন গনে হয়
কথনো কোনো কহেটিরই সম্মুখীন হয়ে যেন
আমাকে ডাকেইনি।** (সুরা ইউমুস, আয়াত ১২)

’’

হে মুসলাব!

আপনাকে আমার খুব ঝিঁঁশা হয়

-ওমর ইবনে সাদিক



ট গবগে যুবক আপনি। মস্ত চেহারা।
চমৎকার আপনার গড়ন। রাজপুত্রের মতো
বললেও কম হয়ে যায়।

দারুল আরকামে গেলেন একদিন আপনি।
একটা মিষ্ঠি দ্বাণ পুরো জায়গা জুড়ে ছেয়ে
গেল। সবার চোখ আটকে গেল আপনার দিকে।
চেহারায় খানিকটা লজ্জা নিয়ে সালাম দিলেন
সবাইকে। বসে পড়লেন একদম পেছনটায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন জান্নাত-জাহানামের
আলোচনা করছিলেন। জাহানামের বর্ণনার সময়
নিদারুণ এক ভয় স্পষ্ট হয় উপস্থিত সবার মুখে।
আবার যখন জান্নাতের বর্ণনা আসে, সবাই
হয়ে উঠে প্রাণবন্ত। আনন্দে খেলা করে উঠে
অন্তরঞ্জলো।

একমনে শুনে গেলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব
কথা। ধীরপায়ে এগিয়ে গেলেন রাসূলুল্লাহ
ﷺ-এর কাছে। জগতের সবচেয়ে পবিত্র
মানুষটার সাথে আপনি পাঠ করলেন সেই পবিত্র
বাক্য। শাহাদাহ।

শান্ত যুবকের পথচলা শুরু হলো। বুকে ঘন্ঘন
নিয়ে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে
এগিয়ে গেলেন আপনি। আসতে থাকল একের
পর এক বাধা।

সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষ মা-ই আপনার
বিরক্তে চলে গেল। পরিত্যাগ করল পরিবার।
খুলে ফেলা হলো আপনার সেই রাজপুত্রের
লিবাস। দামি প্রসাধনী, দামি খাবার-দাবার, বন্ধ
করে দেয়া হলো সব।

কুরাইশের মুশরিকরা আপনার পেছনে লেগে
গেল। বন্দি করে রাখল আপনাকে। এতকিছুর
পরেও যখন একচুলও আপনি নড়েননি সত্ত
থেকে, তারা আপনাকে আরও দীর্ঘদিন বন্দি

রাখল। ভেবেছিল, তাতে হয়তো আপনি থেমে
যাবেন। কী বোকা ভাবনা!

একসময় মুক্তি পেলেন আপনি। যেখানে
কেটেছিল আপনার শৈশব-কেশোরের সোনালি
দিনঞ্জলো, দীনের খাতিরে ত্যাগ করলেন
সেটাও। বন্ধু করে নিলেন জীর্ণ পোশাক,
নিদ্রাইন রাতকে। তবুও আপনি ছিলেন আল্লাহ
এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি পুরোপুরি সন্তুষ্ট।
নিজের সব কষ্ট তখন তুচ্ছ ঠেকতো আপনার
কাছে।

**আপনার নাম শুনলে হৃদয়ে একটা
ডেউ খেলে আয়। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আয়।**

হিজরত থেকে যখন ফিরে এলেন প্রথমবার,
আপনাকে দেখে সবাই হতভঙ্গ হয়ে গেল। কী
থেকে কী হয়ে গেলেন আপনি...

গায়ে ভেড়ার চামড়া জড়ানো অবস্থায় আপনাকে
আসতে দেখে একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের
আপনাকে দেখিয়ে বললেন,

‘তাকিয়ে দ্যাখো ঐ যুবকের দিকে—যার হাদয়কে
আল্লাহ তাআলা আলোকিত করে দিয়েছেন...।
আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা তাকে কোথায়
নিয়ে এসেছে, দ্যাখো।’

শান্ত যুবক থেকে কখন যে আপনি হয়ে উঠলেন
এক পরিশ্রমী যুবক, টের পেলো না কেউ। কত
মানুষকে ইসলামের ছায়ায় আনলেন। অবস্থা
এক সময় এমন দাঁড়াল, ইয়াসরিবের (মদীনার)
প্রত্যেকটা ঘরেই একজন না একজন মুসলিম বা
মুসলিমাহ ছিল।

বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাদা পতাকা তুলে দেয়া হলো আপনার হাতে। খুব আনন্দের সাথে আপনি তা গ্রহণ করলেন। আপনার হাতে পুরোটা সময় উড়ল সেই পতাকা। আপনিও এগুচ্ছিলেন একদম বীরপুরুষ হয়ে...

উহুদের যুদ্ধ। বদরের মতোই সাদা পতাকা দেয়া হলো আপনার হাতে। হ্যাঁ করে পরিস্থিতি হয়ে উঠল ভয়াবহ। মুসলিমদের ওপর আঘাত আসে তীব্রভাবে। এমনকি মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আলাদা হয়ে যায়। সেই কঠিন সময়ে আপনি প্রিয় মানুষটার সঙ্গে ছায়ার মতো ছিলেন। পুরোটা সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে একচুলও সরেননি আপনি।

হ্যাঁ এক মুশরিক ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনার ওপর। তরবারির কোপে আপনার একটা হাত কেটে যায়। অন্য হাতে আপনি পতাকা উঁচিয়ে ধরলেন। খানিকগুরে আসে আরেকটা আঘাত; দ্বিতীয় হাতটাও কেটে যায়। আপনার দু'বাল্ড দিয়ে তবুও আপনি উঁচিয়ে ধরলেন পতাকা। ক্ষান্ত হয়নি সেই নাপাক মুশরিক। একটা বশি বিধে যায় আপনার বুকে। লুটিয়ে পড়েন আপনি। শামিল হলেন সেরাদের দলে।

যুদ্ধ শেষ হলো। আপনাকে দাফন করার জন্য

অভাব পড়ল কাফনের। একটি ছোট কাফন পাওয়া গেল। কিন্তু, ছোট একটি কাফনে তো পুরো শরীর ঢাকা যায় না। মাথা ঢাকলে পা হয় না, পা হলে মাথা...

অর্থাত কী ছিলেন আপনি!

দ্বিনের ভালোবাসায় খুলে ফেললেন রাজপুত্রের পোশাক। হারিয়ে বসলেন বিলাসিতার সকল উপকরণ। আপনার সুন্দর চেহারা মলিন হলো, কপালে ভাঁজ পড়ল। নরম হাতগুলো আজ ভীষণ খসখসে। রাজকীয় জীবনকে লাধি মেরে ফেলে আসলেন আপনি। বুকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য, দ্বিনের জন্য ভালোবাসাকে সঞ্চয় করে এগিয়ে গেলেন কত পথ। সেই পথে চলতে গিয়ে আপনি এক মুহূর্তের জন্যও অভিযোগ করেননি।

হে মুসআব, আপনাকে আমার খুব দীর্ঘ হয়! খুব! খুটুটব! আপনার নাম শুনলে হৃদয়ে একটা টেউ খেলে যায়। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। জান্নাতে আমি আপনার সাথে গল্প করতে চাই। শুনতে চাই আপনার মুখ থেকে দুনিয়ায় আপনার কাটানো সেই দিনগুলোর কথা। কাউসারের পাশে বসে শুনতে চাই আপনার তিলাওয়াত। আমাকে সেই সুযোগ দেবেন, মুসআব? বাদিয়াল্লাহু আনহু।

ତାଙ୍ଗାଳ



ଟାମା

ବନ୍ଦୁଦେର ‘ହାସ୍ୟକର ନାମ’
ବାନିଯେ ମଜା କରୋ ?

ଆରିଫ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ

তোমার বন্ধু সাইজে খাটো, তুমি তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলে - ‘কীরে ট্যাপা, কই যাস?’

আবার ক্লাসের সবথেকে লম্বা বন্ধুকে দেখে দাঁত কেলিয়ে বলে উঠো - ‘কীরে তালগাছ, কেমন আছিস?’

আবার তোমার কোনো তোঁতলা বন্ধুকে দেখলে এক গাল হেসে অভিনয় করে বলো-‘কীরে ক্যা ক্যা, কী করিস?’

মোটাকে মোটু, শুকনোকে চিকনা, যাদের গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ তাদের কাইল্লা, চোখে চশমা থাকলেই কানা বলে চিংকার করা তোমার নিয়দিনের রুটিন, না বলতে পারলে ছটফট করে উঠে ভেতরটা! (একটাবার ভেবে নাও তো, কতটা শয়তানের ওয়াসওয়াসার বশবতী হয়ে আছ তুমি!)

এভাবেই তুমি তোমার বন্ধুদের একেক জনকে একেক মন্দ নামে ডাকো, যা শুনে সে রেগে উঠে কিংবা মুখে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে চিকই কষ্ট পায়। কিংবা তোমার দেওয়া এই বিচিত্র নামগুলোতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মেসেঞ্জার গ্রপেও কিষ্ট নিকনেমে সবাই একেকজনকে একেকরকম নাম দেয়। ফ্রেন্ডসার্কেলকে ঝোজিং না করলে মাঝে মাঝে নিজেকে মানুষই মনে হয় না আর।

তুমি প্রত্যহ হাসি-ঠাট্টায় অহরহ মন্দ নাম বলে যাচ্ছ। তোমার কাছে এসব কোনো গুনাহ-ই মনে হচ্ছে না। কিষ্ট তুমি কি জানো, ঠিক এই কারণে আল্লাহ তোমার নাম যালিমদের তালিকায় নিতে পারেন?

আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অন্য কোনো নারীকে উপহাস না করে। কেননা তারা উপহাসকারিণীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে

অন্যকে দোষারোপ কোরো না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত অপরাধ। আর যারা এহেন অপরাধ থেকে তাওবা না করে তারাই প্রকৃত যালিম।’^[১]

একটু ভেবে দেখো তো, এটা তোমার জন্য কত মারাত্মক রকমের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে! একদিকে আল্লাহর কাছে তুমি যালিম! আরেকদিকে গুনাত্তের কারণে আয়াবের ভয়! সেই সাথে তোমার বন্ধু কষ্ট পেল, এবং তোমার ব্যক্তিত্বের ঘটুকুও দিন দিন মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে!

বন্ধুর সাথে তো সম্পর্ক থাকা চাই মধুর। তুমি কি জানো, তোমার বন্ধু তোমার কাছে কী চায়? তোমার বন্ধু তোমার কাছে চায়:

- উত্তম ব্যবহার।
- বিপদে সাহায্য।
- আন্তরিকতা।
- আত্মের বন্ধন।

তাই, বন্ধুর সাথে দেখা হলে একে অপরকে দেখলে আগে সালাম দেবে। কখনো যদি, ঝগড়াঝাপ্টি হয়ে যায়, তবে নিজে আগে থেকে মিট্যাটের জন্য যাবে, বিপদে সাহায্য করবে। দেখবে, সেটা একদিন প্রতিদান হিসেবে ফিরে আসবে।

তাই আজই তাওবা করো। হাসি-তামাশার ছলেও বন্ধুদের আর মন্দনামে ডাকা নয়। কী দরকার সামান্য একটু বিনোদনের জন্য নিজেকে জাহানামের আগুনের দিকে ধাবিত করার? আর এমন অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু আসে! ভেবে দেখো তো একবার! হাজারো ওয়াক্ত সালাত, সাওম, দান-সাদাকাহ করলে অথচ মৃত্যুর সময় যালিম হয়ে মরতে হলো! আর মন্দ নামে ডেকে তুমি তো বান্দার হক নষ্ট করলে। সেক্ষেত্রে কীভাবে ক্ষমা পেতে পারো? যদি তোমার বন্ধু ক্ষমা না করে?

[১] সুরা হজরাত : আয়াত ১

আমার

প

রী

ক্ষা

খাতা

সুমাইয়া সিদ্ধিকা

এমফিল গবেষক
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

দীপ্তি

Note

A⁺

বই

১০০

৩০০

Golden

F

পরীক্ষা শব্দটা শুনলেই একটা ছড়ার কয়েক লাইন মনে পড়ে যায়। ছোটবেলায় কিশোরদের উপর্যোগী একটা ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম। যদি ও লেখকের নাম মনে নেই আজ আর।

“জানিস না তো ছি
কালকে আমার কী?
কালকে আমার পরীক্ষা
জীবন-মৰণ তিতিক্ষা।
তাই তো আমি পড়তে বসেছি।”

সত্যিই আমরা অনেকেই আছি সারা বছর চেয়ার-টেবিলের কাছে না গেলেও। যেই পরীক্ষা আসে অমনি অতি মনোযোগী হয়ে উঠি।

আবার পরীক্ষার ধরনের কথা যদি বলে, তবে সেই শিশুশ্রেণি থেকে আজ অবধি কত যে পরীক্ষা দিয়ে এলাম তার কোনো ইয়াস্তা নেই। তবে আমার মনে হয়, এখনকার বাচ্চাদের পরীক্ষার ধরন ও সংখ্যা অনেক বেশি। আজ ক্লাস টেস্ট তো কাল সারপ্রাইজ টেস্ট, পরশু হয়তো মাস্টলি টেস্ট। আরও আছে সেমিস্টার এক্সাম, ফাইনাল এক্সাম, বোর্ড এক্সাম। নাম না জানা আরও কত যে এক্সাম যে দেয় ছাত্র-ছাত্রীরা! পরীক্ষা দিতে দিতে অস্থির হয়ে যায়। পড়ালেখাটা একটা ভয়ের বিষয়ে পরিণত হয় অনেকের কাছে। কারণ, ভালো রেসাল্ট শুধু নয়, সবার চেয়ে ভালো করার অতিরিক্ত একটা প্রেশার থাকে সবসময়। ফলে শৈশব-কেশোরের দুরন্তপনা পিষ্ট হয় পরীক্ষার যাঁতাকলের নিচে। আসলে কোনো কিছুই অতিরিক্ত যেমন ভালো না, তেমন কমও ভালো না।

সে যাহোক, এবার মূলকথায় ফিরে আসি। আমার মায়ের ছোটবেলার গল্প বলি তোমাদের। একেবারে প্রথম শ্রেণিতে পড়েন তখন তিনি। সুন্দর হাতের লেখায় সারা খাতা ভরে লিখে খাতাটা সুন্দর মতো ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে

এসেছিলেন। ফলস্বরূপ ঐ পরীক্ষায় গ্রেস দিতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক। কী আর করা! সে তো প্রতিদিনই খাতা বাসায় নিয়ে যেত। আজ যে দিয়ে যেতে হবে তা কে জানত!

তোমরা কিন্তু ভুলেও এ কাজটি কোরো না। আম্মা হাসতেন আর পরীক্ষা এলেই তার জীবনের গল্পটা আমাদের মনে করিয়ে দিতেন। আর আববা সবসময় বলতেন, পরীক্ষার হলে বিশেষ করে পাবলিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে যেন সীটের চারদিকে চেক করে বসি। বলা তো আর যায় না, যদি কেউ দুষ্টমি করে নকলের টুকরা কাগজ ফেলে রাখে। আর নকল করে দেখে লেখা আমরা অবশ্য কল্পনাই করতে পারতাম না। আববা জানতে পারলে বাড়িছাড়া করবেন বলে হৃষকি দিতেন।

তবে একটু আধটু শুনে লিখেছি ছোটবেলায়। একটা সময় পর ওটাও আর করতাম না। মনে হতো সবই হারাম হয়ে যাবে।

এবার বলি পরীক্ষার আগের রাতের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার আগের রাতে এক ফোটাও ঘুমাতে পারিনি। উদ্বেগ আর উৎকঢ়ায় কেটেছে প্রতিটি মূর্হুত। সারারাত জেগে পড়েছিলাম। অবশ্য পরীক্ষার হলে যে বিশুনি আসেনি অস্মীকার করব না। তাই বন্ধুরা সাবধান! ভুলেও এ কাজ করতে যেয়ো না। আগের রাতে নিরবচ্ছিন্ন ঘুম খুবই প্রয়োজন। তবে এজন্য তোমাকে অবশ্যই সারা বছর খাঁটা-খাঁটুনি করে পড়ালেখাটা এগিয়ে নিতে হবে। আমি অবশ্য একটা ট্রিক ফলো করতাম। চুপি চুপি তোমোদেরও বলি। কান লাগিয়ে শোনো। শিক্ষকদের লেকচারগুলো খুবই মনোযোগের সাথে শুনতাম। নেট নিতাম। প্রতিদিনই কিছু পড়া এগিয়ে রাখতাম। মূল বইগুলো আগেই রিডিং পড়ে রাখতাম। ফলে ক্লাসে আর নতুন

মনে হতো না। সহজ লাগত। যেখানে বুবাতাম না ওটাও মার্ক করে রাখার ফলে শিক্ষকের কাছ থেকে বুঝে নিতে পারতাম। তাই পরীক্ষার আগের রাতে প্রেশার কম থাকত।

আর নিজে নিজেই আগের সালের প্রশ্ন দেখে বা মডেল টেস্ট ধরে ধরে সময় ভাগ করে পরীক্ষা দিতাম। ফলে কখনোই পরীক্ষার হলে সময়ের টানাটানি হতো না। মজার ব্যাপার কী, এভাবে লেখার ফলে অনেক দ্রুত লেখার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। ফলে পরীক্ষার সময় ১০/১৫ মিনিট আগেই লেখা শেষ হয়ে যেত। এরপর বেশি কয়েকবার খাতা রিভিশন করার সুযোগ পাওয়া যেত, যা বানান ভুল শুধরে নিতে অনেক বেশি সাহায্য করত।

অনেক সময় দেখা যেত, এমন সময়ে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে যখন পরীক্ষা শেষ হবে তখন আর সালাতের ওয়াক্ত থাকবে না। তো তখন কী করব? সালাত কায়া করবে? অবশ্যই না। যিনি গার্ডে থাকবেন তার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ফরয়টুকু হলেও আদায় করে নেওয়া। কতজন তো ওয়াশরুমেও ছুটে। তবে বেশিরভাগেরই

ধান্দা থাকে টুকরা কাগজে চোখ বুলানোর। বা নিকাবও করতে দিচ্ছে না। নিকাব খুলে ফেলব? কখনোই না। মহিলা শিক্ষকের কাছে যাচাই করতে অনুরোধ করা। তুমি যদি দৃঢ় থাকো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন।

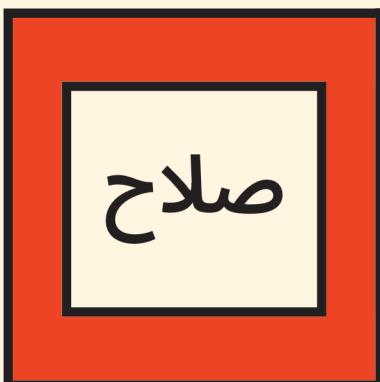
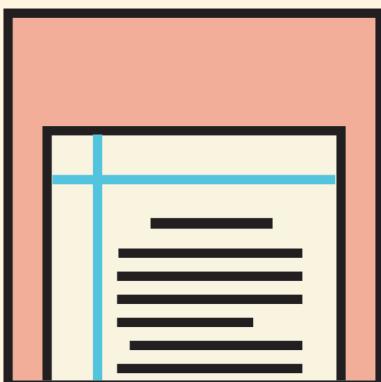
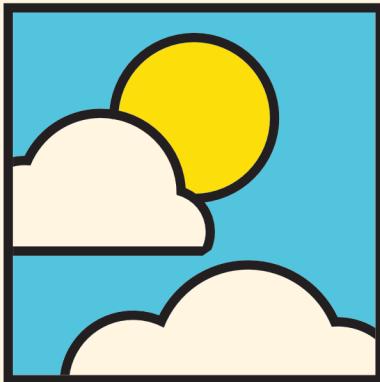
তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো আল্লাহর সাহায্য। পরীক্ষার হলে যাওয়ার পূর্বে দুই রাকাআত সালাত পড়ে সাহায্য চেয়ে নিতে ভুলো না। আর দুআ তো ভাগ্য বদলাতে সাহায্য করে। তাই না!

প্রিয় বন্ধুরা! দুনিয়ার জীবন তো মুমিনের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। পরীক্ষা তো থাকবেই। তাই শুধু পড়ালেখা নয়। সবকিছুতেই হতে হবে আমাদের অনন্য। তবেই না জান্মাতি উদ্যানে ঘুরতে পারব ইচ্ছামতো। তাই আজ থেকে সময়ের কাজ সময়ে করে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল পরীক্ষায় উন্নীর্ণ হওয়ার জন্য নিজেকে আরও বেশি দক্ষ করে গড়ে তুলব। এ প্রত্যয়ে হোক আমাদের নতুন দিনের শুভ সূচনা।

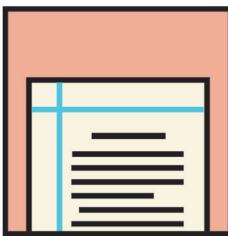
**শপথ সময়ের। মানুষ বড়ই ঝুতির মুখে আছে।
কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ইমান আনে, সৎ কর্ম করে গ্রহণ
একে অপরকে হকের নিদেশ দেয়ে ও
সবরের নিদেশ দেয়।**

(সূরা আল আসর, আয়াত ১-৩)

রবের উপহার



তাহরিমা জামান তুবা
রিজিয়া বেগম মহিলা কলেজ
ইন্টার প্রথম বর্ষ



বছরখানেক আগের
ঘটনা! আমি তখন
পুরোদস্তর ইসলাম
মেইনটেইন শুরু
করেছি। রবের সাথে
ভীষণ ভালো বন্ধুত্ব।

হিদায়াত পাওয়ার প্রথম দিকের স্বপ্নময় সময়।
সেই চমৎকার সময়ে আমার কলেজ থেকে টেস্ট
পরীক্ষার নোটিশ এলো। সাথে পরীক্ষার রুটিন।
প্রতিদিন দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত পরীক্ষা
চলবে। যুহরের ওয়াক্তের পুরো সময়টাই চলে
যায় পরীক্ষার সময়ের মধ্যে। তাহলে সালাতের
কী হবে! আমি কলেজে অ্যাপ্লিকেশন দিলাম।
প্রিসিপাল স্যার ডেকে পাঠিয়ে জানালেন,
আমার একার জন্য এক্সাম শিডিউল বদলানো
যাবে না। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, গার্ড
টিচাররাও কি সালাত পড়বেন না?!

ক্লাসের তিন শ মুসলিম (!) স্টুডেন্টদের মাঝে
হাতে ক্যান্সেলড হওয়া অ্যাপ্লিকেশন পেপার
আর চোখভর্তি পানি নিয়ে আমি বজ্রাহত হয়ে
বসে রাখলাম। এ কোন পরীক্ষা এলো আমার
জন্য!

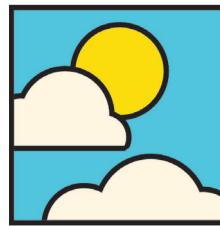
ভীষণ মন খারাপ নিয়ে বাসায় ফিরলাম সেদিন।
তারপর কুরআন খুলতেই প্রথমে চোখ পড়ল
সূরা মুমিনুরের প্রথম আয়াতে। সফলতার উপায়
বাতলে দিচ্ছেন এই বিশ্বজাহানের অধিপতি স্বয়ং
আল্লাহ সুব্হানাত্ত ওয়া তাআলা!

সেসকল মুমিন সফল হয়েছে, যারা নিজেদের
সালাতে বিনয়ী!

আমার অন্তরে প্রশাস্তির হাওয়া বইল। পরীক্ষার
জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। দুনিয়ার
লেখাপড়ার জন্য আমি দ্বীন স্যাক্রিফাইস করতে
পারব না। ঠিক করলাম বাসা থেকে সালাত

পড়েই হলে যাব আমি। এতে যত দেরি হবার
হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমার জন্য
দুনিয়ার চাইতে আখিরাতই উত্তম।’^[১]



অট্টোবরের ১৫
তারিখ থেকে পরীক্ষা
শুরু হলো। ১১ টা
৪৮ থেকে যুহরের
সময় শুরু হয়। শুধু
ফরজ সালাত পড়ে
পরীক্ষা দিতে যাবার ব্যাপারে ইসতিখারা
করেছিলাম আগের রাতে। কিন্তু পজিটিভ
নেগেটিভ কোনো সাইন-ই পাইনি। তাই
প্রথমদিন শুধু ফরজ সালাত পড়েই পরীক্ষা
দিতে গেলাম। পুরো তিন ঘণ্টা সময় পাওয়া
সত্ত্বেও পরীক্ষা তেমন ভালো হলো না।

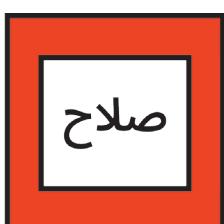
বিকেলে আবার ইসতিখারা করলাম ব্যাপারটা
নিয়ে। আর এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখলাম। আল্লাহর
কাছে তাওবা করে প্রচুর কানাকাটি করলাম।
পরের পরীক্ষায় আর সেই পথে পা দিলাম না।
সুন্নাতসহ পুরো দশ রাকাআত সালাত খুশি-খুয়ুর
সাথে আদায় করে হলে গেলাম প্রায় ৫০ মিনিট
দেরি করে। পরীক্ষা অনেক খারাপ হলো। তবুও
মনের মধ্যে অঙ্গুত প্রশাস্তি কাজ করছিল। বাসায়
ফিরে দু’রাকাআত শুকরানা সালাত পড়লাম।
পরীক্ষা এত খারাপ হবার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো
কল্যাণ রয়েছে! আমার রব যা জানেন, আমি
তা জানি না। আমার পুরো ভরসা আছে তাঁর
প্রতি। তখনো জানতাম না আমার এই সবর এর
পুরস্কার হিসেবে রবের পক্ষ থেকে আমার জন্য
কী চমৎক অপেক্ষা করছে!

আর আমার গঞ্জের শুরু এখান থেকেই!

[১] সূরা আলা, ৮৭ : ৪



দিনটা ১৯ অক্টোবর
২০১৯! সেদিন হলে
পৌঁছুতে আমার পাক্কা
১ ঘন্টা দেরি হলো।
বাংলা প্রথম পত্র
পরীক্ষা, অনেক
লেখা। হাতে সময় মাত্র দু'ঘন্টা। তার মাঝে আধা
ঘন্টা আবার অবজেক্টিভের জন্য। আমি ব্যাপারটা
নিয়ে তেমন মাথা না ঘামিয়ে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে
লিখতে শুরু করলাম। ওয়াল্লাহি! আমার মনে
হলো, আমার হাতে কেউ চাকা সেট করে
দিয়েছে, হাতের ওপরে কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই।
আর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো,
প্রশ্নপত্র দেখার সাথেই সাথেই উভরগুলো মুখস্থ
উভরের মতো আমার মাথায় সাজানো হয়ে
যাচ্ছিল। ফোর-জি স্পিডে আমার হাত চলছিল।
ব্যাপারটা মনে পড়লে আমি এখনো চমকে উঠি।
১ ঘন্টা ২০ মিনিটে আমার সাতটা সৃজনশীলের
উভর লেখা শেষ করে আমি যখন খাতা স্ট্যাপল
করছিলাম, সবাই অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে ছিল
আমার দিকে! আমার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিল
না।



পরীক্ষা শেষে বাসায়
ফিরে আমি সোজা
সালাতে দাঁড়ালাম।
কানায় কঠরোধ
হচ্ছিল বারবার,
'শীর্ষাই তোমার রব
তোমাকে এত দিবেন যে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে!'^[১]

পরের পরীক্ষাগুলোতেও আমার প্রায়
ষষ্ঠাখানেক লেট হতো। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার
হচ্ছে, সেই পরীক্ষাগুলোতে বাংলা পরীক্ষার

মতো মিরাকল না ঘটলেও আমি অবাক হয়ে
লক্ষ্য করছিলাম, আমি সাধারণ গতিতে লিখতে
থাকলেও সবার আগে আমার উভর লেখা শেষ
হয়ে যায়। ওরা ধীরে লিখছে নাকি আমি দ্রুত
লিখছি বুঝতে পারছিলাম না। একদিন আশ্মুর
সাথে ব্যাপারটা শেয়ার করলাম। আশ্মু বেশ
খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন,
তারপর হাসলেন, ‘এইটুকু বুঝতে পারলে না?
তুমি সময়ের সৃষ্টিকর্তার ইবাদাতকে প্রাথান্য
দিয়েছ, তাই সময়ের সৃষ্টিকর্তাও সময়কে আদেশ
করেছেন তোমার জন্য বরকতময় হয়ে যেতে!

**When you respect the
creator of time, He makes
time work in your favour!**

(যখন তুমি সময়ের সৃষ্টিকর্তাকে সম্মান করবে,
তখন তিনি সময়কে তোমার পক্ষে কাজ
করাবেন।)

সূর্য ডুবছে, জানালার ফাঁক গলে একফালি
মিষ্টি রোদ এসে পড়ল আমার নয়নতারা গাছের
ওপরে। আমি সম্মোহিতের মতো বসে রইলাম।
কানে ক্রমাগত বাজছে, ‘He makes the
time work in your favour!’
চোখ দিয়ে অজান্তেই দু'ফোঁটা পানি গড়াল,
'হে আমার রব! আপনাকে দেকে আমি তো
কখনোই নিরাশ হইনি!'^[৩]

[১] সূরা দুহা ৯৩ : ৫

[৩] সূরা মারহিয়াম, ১৯ : ৪

শব্দখেলা

১	২		৩		৪	৫	৬
৭			৮				
৯					১০		
১১					১২		
১৩							
				১৪		১৫	
১৬	১৭	১৮	১৯		২০		
	২১				২২		

পাশাপাশি

১. বিত্তীর্ণ। ৮. সমস্ত। ৭. ‘বক’ এর বিকৃত রূপ। ৮. নদী মাতা যার। ৯. *Oryza sativa* ১০. Pressure
 ১১. সুরা বাকারার ২৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ যে জিনিসটি নিশ্চিহ্ন করেন। ১২. রক্ষাকারী। ১৩. দ্রুত। ১৪.
 জননী। ১৫. দীনের স্বতঃসিদ্ধ ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে কুফরের দিকে
 পরিচালিত করা। ২০. যে যুদ্ধে মুসলমানদের প্রধান প্রতিপক্ষ আবু জাহেল মারা যায় ।। ২১. সমানের
 সাথে নম্বৰতা প্রকাশ করা। ২২. চুপচাপ।

উপর-নিচ

১. যা ঘটবেই। ২. বাংলা। ৩. দুহিতা। ৪. সংবাদ। ৫. কর্তৃত্ব। ৬. তালা। ১৫. যে মহিমান্বিত রজনীতে
 সর্বপ্রথম আল-কুরআন নাযিল হয়। ১৭. Creeper এর প্রতিশব্দ। ১৮. যারা হজ পালন করে। ২০. হজ
 উমরাহ আদায়ে ওয়াজিব ছুটে যাওয়া জনিত ভুল ক্রটি হলে তার কাফফারা স্বরূপ একটি পশ্চ যবেহ করে
 গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। ২০. প্রতিষ্ঠাতা, রচনাকারী।

উত্তর পার্শ্বে এই ঠিকালায়,

quiz.sholo@gmail.com

মেইলের Subject এ অবশ্যই “শব্দখেলা” কথাটি লিখতে হবো। বিজয়ী তিনজন পাবে “১০০ টাকা” করে “মোবাইল রিচার্জ”।

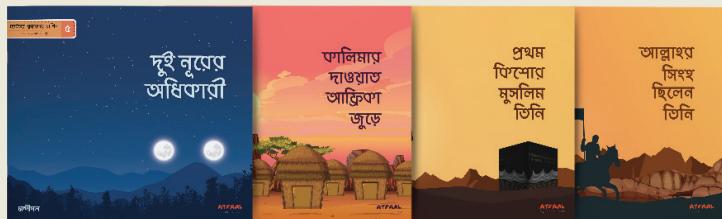
ছেটদেৱ খুলাফায়ে রাশিদা

৬ থকে ১০ বছৰ বয়সী শিশুদেৱ জন্য।



৮ টি বইয়েৰ সেট

মূল্য: ১০০০ টাকা



ছেটি সোনামণিদেৱ জন্য আমৰা নিয়ে এমেছি 'ছেটদেৱ খুলাফায়ে রাশিদা' সিৱিজ। গল্প গল্পে সোনামণিৰা এবাৰ জেনে যাবে সুপথপ্রাপ্ত চার খলীফার বৰ্ণাত্য জীৱনী, যাবা ছিলেন এই উল্লাহৰ সেৱাদেৱ সেৱা।

'আমাৰ প্ৰথম পাঠগার' সিৱিজ

২ থকে ৬ বছৰ বয়সী শিশুদেৱ জন্য।



৮ টি বইয়েৰ সেট

মূল্য: ৯০০ টাকা

এই সিৱিজটি থেকে বাচ্চাৱা যেমন অ আ ক থ শিখবে, তেমনি শিখে যাবে আমাদেৱ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দীনেৱ গুৱৰুপূৰ্ণ কিছু বিষয়।

আমাদেৱ সাথে নিবিড়ভাৱে মুজু হতে জয়েন কৰুন আমাদেৱ ফেইসবুক গ্ৰুপ কিতাবিয়ান-এ!

লিঙ্ক- <https://www.facebook.com/groups/kitabiyan>

sondiponbd

www.sondipon.com

sondiponprokashon@gmail.com

01779 19 64 19 ,01406 300 100

34, Madrasa Market (1st Floor), Banglabazar

জন্মলোক

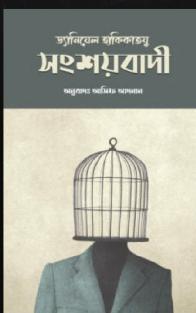
প্ৰ কা শ ন লি মি টে ড

ইসলাম কেন

বাকস্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না ?
মুক্তিচিন্তার স্বীকৃতি দেয় না ?
ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না ?
শুধু নারীকেই হিজাব পরতে বলে ?

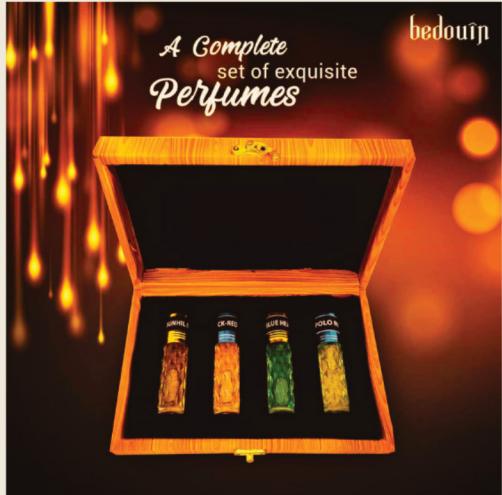


ইসলামের নিয়ে আধুনিক এসব আপনির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা অনেকেই বুঝি না। এই প্রশ্নগুলো শুন্য থেকে আসেনি। এগুলোর পেছনে আছে পরম্পরার সম্পর্কিত বিভিন্ন পূর্বধারণা। প্রশ্নগুলো আমদের কাছে ‘কঠিন’ মনে হয় কারণ প্রশ্নের পেছনের ধারণাগুলোকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বপ্রমাণিত সত্য হিসেবে মনে নিয়েছি। কিন্তু এই ধ্যানধারণাগুলো যে সঠিক, এগুলোর যে নেতৃত্ব বৈধতা আছে তার প্রমাণ কী? লিবারেলিসম, জাতি-রাষ্ট্রের প্যারাডাইম, বিজ্ঞানবাদ, মানবতাবাদ, নারীবাদ, প্রগতিবাদের মতো মডার্নিস্ট বিশ্বাস আর মতবাদগুলোকে আজ বিনা প্রশ্নে মনে নেয়া হয়। কিন্তু একজন মুসলিম কি এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না? এগুলোর ব্যাপারে সংশয়বাদী হতে পারে না? একজন মুসলিম সংশয়বাদীর কাজ হল মাটি খুড়ে এসব মতবাদের পেছনে থাকা ধারণাগুলোকে বের করে আনা। সেগুলোকে প্রশ্ন করা, সেগুলোর ব্যবচ্ছেদ করা। এই প্রশ্নগুলো করতে শেখা এবং এসব ধারণার ব্যাপারে সংশয়বাদীতার অবস্থান গ্রহণ করা হল সন্দেহ এবং সংশয় সমাধানের প্রথম ধাপ।



সংশয়বাদী
ড্যানিয়েল হাকিকাত্যু
অনুবাদ - আসিফ আদনান
“সংশয়বাদী” শেখাবে - আধুনিকতার মাপকাঠিতে
ইসলামকে বিচার করার বদলে আধুনিকতাকে
ইসলামের চিরস্তন মাপকাঠিতে যাচাই করতে।

bedouin



বিভিন্ন অ্যারাবিয়ান সুগন্ধের
পাশাপাশি বেদুইনে পাওয়া যায়
বিশ্বের নামকরা ব্র্যান্ডের নন
এলকোহলিক রোলঅন আতর।
এছাড়াও আমাদের কাছে পাবেন
ক্যাসুয়াল এবং ফরমাল কোটি ও
বাহারি পাঞ্জাবি।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আর রুচিশীল মানুষ
ছিলেন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.)। তাঁর চরিত্র,
আচার আচরণ, পোশাক সবকিছুর মধ্যেই
আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।
নবিজী (সা.) সুগন্ধি খুব পছন্দ করতেন। তাঁর
দেহ মোৰারক থেকেও সব সময় সুবাস
ছড়াতো। তিনি রাত্তা দিয়ে হেঁটে গেলে সুগন্ধির
ঝরনা বয়ে যেত। মানুষ খুব সহজেই বুঝতে
পারত, নবী করিম (সা.) রাত্তা দিয়ে হেঁটে
গেছেন।

‘চারটি বস্তু সব নবীর সুন্মত—আতর, বিয়ে,
মেসওয়াক ও লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা।’
(তরজমা, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২২৪৭৮)
নবিজী (সা.) নিজে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।
তাঁর উম্মাহকেও সাধ্যমত সুগন্ধি ব্যবহার
করতে বলেছেন।

বেদুইনের পথচলা শুরু নবিজী (সা.)-র এই
সুন্মাহ সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্য।
বেদুইনের পারফিউমগুলো আপনাকে রুচিশীল
মানুষ হিসেবে সমাজের দশজন লোকের ভীড়ে
আলাদা করবে, সেই সাথে বাড়াবে আত্মবিশ্বাস।
ইন শা আল্লাহ।